জন্মদিন সংখ্যা । জুন, ২০১৪

অবকাশ

ফিরে এলো ৮-ই জুন, আরও একবার শেষ হয়ে গেল ছয় ঋতুর পরিক্রমা। একটি পূর্ণ বছর পেরিয়ে এসে আরেকটু বড় হয়ে উঠল আমাদের ‘অবকাশ’ –

যে জ্যৈষ্ঠ মাসে তার জন্ম, তার প্রচণ্ড দাবদাহের মতই প্রখর অবকাশ, আবার ঠিক পরেই যে আসতে চলেছে সেই আষাঢ় মাসের কোমলতাও সে জড়িয়ে রেখেছে অঙ্গে

এই সব মিলিয়েই আবার.........

কবিতা

রভস – সুমন মল্লিক – ১

পর্ণমোচন – সৌরভ কুমার দাস – ২

জলের ক্যালিডো দর্পণে – অভিমন্যু – ৯৫

রিপ্লেসমেন্ট – নবকলম – ৯৭

রান্নাঘর

ঠাণ্ডা হওয়ার আয়োজন – প্রত্যয়দীপ্ত রুদ্র – ২৬

অবকাশ মাছের বিরিয়ানি – অনির্বাণ শ্যাম – ৪২

গল্প

লক্ষ্যভ্রষ্ট – পার্থ প্রতিম রায় – ৩

হোটেলে একটি রাত – দেবুমু – ১৩

আজি এসেছি... – সীমা ব্যানার্জি রায় – ২৯

পরমজিতের পা – ডাঃ শ্রীমতি অন্নপূর্ণা বসু – ৩৫

সমাপতন – সিদ্ধার্থ দেব – ৭৪

বদান্যতা – দেবব্রত মুখোপাধ্যায় – ৮৩

রহস্য ও লেখক – উত্তরায়ন – ১০৪

রম্যরচনা

বইমেলার সত্যিকারের কৌতুক – অদিতি কবির – ২১

রামদাস তপস্বী – রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য – ৪৮

গরম ও আনুষঙ্গিক – ডাঃ অশোক দেব – ৯৮

মুক্তগদ্য

সফট ফোকাস – উদীচ্য – ৪০

প্রবন্ধ

সবার প্রিয় অ্যাসটেরিক্স – অনুভব বক্সী – ১১৬

রভস

সুমন মল্লিক

কেয়ূর লেগে আছে
হাতের তালুদুটোয়
প্রথম দিন থেকেই।
শরীরে বয়ে বেড়াই
তোমার পিঠের
বিজবিজে ঘাম।
বিমূর্তি তোমার আমাকে
একফোঁটাও দেয় না শুতে।
ভালবাসো?
জানি, জানি...
কেন তবে রাতভোর দাও
অগ্নি-কাম ?

পর্ণমোচন

সৌরভ কুমার দাস

জায়মান মানেই যে নির্বিষ নয়
এই কথা বোঝাতে চেয়েছিলাম।

নতুন এক অস্ত্র জন্ম নেয় – প্রতিদিন -
অলস আমার চাদরের তলায়,
শীতঘুমে থাকা স্বপ্নদোষে
জন্ম নেয় বীভৎস লড়াকু এক ইচ্ছা।

বাগানের একমাত্র যে পর্ণমোচী গাছ
তাকে আমি জল দিই, সে প্রত্যেক বছর
নতুন সংকল্পের জন্ম দেয়।

আস্তাকুঁড়ভোজী পাগলটার কাছেও
কেউ একদিন
ভালবাসার সংকল্প করেছিলো।
সেসব স্মৃতি পচা পাউরুটির মতো
বেমালুম চেটেপুটে সাফ।

পর্ণমোচী গাছ
ঝরে যাওয়া পাতার
খোঁজটুকুও রাখে না।

লক্ষ্যভ্রষ্ট

পার্থ প্রতিম রায়

আঠেরোতলার ব্যালকনিতে বসে বসে সিগারেটে একটা টান দিল মাধবী। রিং করে ছাড়া ধোঁয়াগুলো পাক খেতে খেতে উড়ে গেল। অনেকদিন পর নিজের হাতে মশলাটা বার করে, গুঁড়ো করে গাঁজা ভরে বেশ কড়া করে বানিয়েছে সিগারেটটা। মাথাটা বেশ হালকা লাগছে। সামনের তেপায়াতে রাখা হুইস্কির গ্লাসটা। আজ একটুও জল মেশাতে ইচ্ছে করছে না। সোনালি তরলে ভেসে বেড়াচ্ছে কয়েক কুঁচি বরফখণ্ড। সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিল কি ভাবে যেন সব ওলটপালট হয়ে গেল। কদিন আগেও জীবনটা মনে হত মেঘের উপর ভাসছে – ওই বরফখণ্ডগুলির মতই।

নিমেষে কতকিছু ঘটে গেল - ভাবতেও ইচ্ছে করছে না। মনটাকে বুঝিয়েছে যে নেশাটা চেপে বসার আগেই এবার লাফিয়ে পড়বে ব্যালকনি থেকে নিচের দিকে। কিন্তু মনটা বড় বেয়াড়া। একবার জানতে চাইল কেন মাধবী লাফিয়ে পড়বে – লোকলজ্জা? কার সামনে লজ্জা তার? আজ তো সুমিত আর ওর সামনে এসে দাঁড়াবে না। সুমিত তো ওকে এই ফ্ল্যাট স্বেচ্ছায় দান করে চলে গেছে। মুক্তি দিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। তবে কি মাধবী নবীনের মুখোমুখি হতে লজ্জা পাচ্ছে?

নবীন তো কাল বলেই দিল – “আমি তো তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না মাধবী। তুমিই সাতবছর আগে আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে। তারপর ঘটনাচক্রে আবার দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাই বলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কোন প্রয়োজন আছে কি? বরং তুমি আমাকে ছেড়ে যাবার পর আমি দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কেই আর বিশ্বাস করি না। কোন মহিলার সাথে সম্পর্ক যত কম সময়ের হয় ততই ভাল। সেটা এক রাতের বা সন্ধ্যের কয়েকটা ঘণ্টার হলে আরও ভাল। আর মাধবী তুমিও তো তাই উপভোগ কর। তবে হ্যাঁ তোমার সামাজিকভাবে একটা সম্পর্ক রাখার শখ বা পরিচয় রাখার

দরকার ছিল, তাই আমাকে তিনবছর ধরে স্বপ্ন দেখিয়ে একটা বিশাল চাকরিওয়ালা ছেলেকে বিয়ে করেছিলে।”

মাধবী বলেছিল – “কিন্তু নবীন এই তো সেদিন মন্দারমণির হোটেলে আমাকে কোলে বসিয়ে আমার ঘাড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে বললে, তুমি সুমিতকে ছেড়ে আমার সাথে চলে এসো সোনা। দুজনে মিলে রোজ এইভাবে পূর্ণিমার রাতের সমুদ্রের সাথে উপভোগ করব দুজনে দুজনকে। বল সব মিথ্যে? বল এসব তুমি বলনি? তুমি আমাকে এসব স্বপ্ন দেখাও নি?”

- না ওগুলো মিথ্যে নয়, তবে সত্যিও নয় মাধবী...

- তুমি কি বলতে চাও নবীন? আমি আজ তোমার জন্যে সব ছেড়েছি। আর তুমি আমায় লোভ দেখিয়ে আমার সব কেড়ে নিয়ে মজা করছো? তুমি কি আমার উপর প্রতিশোধ নিলে এতদিনে? বিশ্বাস কর সেদিন আমি বাড়ির চাপে বাবার পছন্দ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ফোনের ওদিকে একটু চুপ থেকে নবীন বললো – “শোন মাধবী, স্বাভাবিক সময় দুটি নারীপুরুষ যখন হাত ধরাধরি করে ভবিষ্যতের জাল বোনে সেটাকে স্বপ্ন দেখা বলে। পড়ন্ত বিকেলে গঙ্গার ধারে বসে ছেলেটি যখন বলে, মেয়েটি তখন দুহাঁটুর ওপর চিবুক রেখে শোনে। মেয়েটি বললে ছেলেটি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কথা শোনার জন্যে নয় - ওষ্ঠবর্ণ, দন্ত্যবর্ণ বা তালব্যবর্ণের সাথে মেয়েটির ঠোঁট আর জিভের খেলা দেখবে বলে। এগুলো হল জীবনের স্বপ্ন দেখা – যেটা চাইলে, চেষ্টা করলে বাস্তব হতেই পারে। যেটা তুমি আমি দেখতাম আজ থেকে সাতবছর আগে। আর মায়াবী রাতে এক পুরুষ আর এক নারী আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে একে অপরকে যা বলে সেটা মিলনের লিপ্সা বা কামজ খোশখেয়াল। সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে উত্তেজিত করা – কিছু সময়ের জন্যে। আমি তো তোমাকে অন্য সময়ে কখনও এসব বলিনি। এসব কথা তুমিই বলেছ যখন আমরা দুজন একসাথে রাত কাটিয়েছি – কখনো মন্দারমণি, কখনো ব্যাংকক, কখনো বা

দার্জিলিং। তুমি স্বভাবে আর আমি অভাবে বহুগামী। কিন্তু সেটা তো একরকম পশুর জীবন। সেটা কি সুস্থ মানুষের শোভা দেয়? মাধবী, সব মানুষই হয়তো মনে মনে বহুগামী, কিন্তু বাস্তবে কি সেটা সম্ভব? সমাজ সেটাকে মেনে নেয় না। তুমি আমি চাইলেই তো সারাজীবন আমরা হোটেলে একে অপরের আলিঙ্গনে কাটাতে পারব না। যেমন তুমি আমি চাইলেই রোজ রাতে পূর্ণিমা হবে না। আর বাড়ির চাপ বা আমার জন্যে সব ছাড়ার অজুহাত দিও না। তুমিও জান তুমি যা করেছ শুধু নিজেকে ভালবেসে। অনেক কিছুই পেয়েছ – বাবা, মা, ভালো স্কুল, গাড়ি, বাড়ি, বাধ্য ভাই, একনিষ্ঠ প্রেমিক, বিত্তশালী বর, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী-দেওর-ননদ, বালিগঞ্জের দোতলা শ্বশুরবাড়ি, গার্ডেন সিটিতে নিজের নামে তিন কামরার ফ্ল্যাট, বিদেশ ভ্রমণ, বেহিসেবী টাকা, প্রচুর গয়না আর একাধিক পুরুষসঙ্গী। কিন্তু কারও জন্যে কিছু করার সুখ কখনও পেয়েছ মাধবী? পাওনি। পাওনি আপন কাউকে হারানোর দুঃখও। ফোন ছাড়লাম, তুমি নিজেই একটু ভেবে দেখো কেমন?”

২.

মাধবীর বাবা ছিলেন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মাইনের সাথে উপরি অফিসের চালকসহ গাড়ি, বেশ বড় একটা কোয়ার্টার। ঝি চাকর থাকলেও মা ছিলেন আদর্শ পারিবারিক গৃহবধূ। পরিবারের সবার দিকে সমান নজর। মাধবীদের পরিবার মানে – বাবা, মা, ভাই, মাধবী, দাদু, ঠাকুমা আর কাকুমণি। দাদু একটু রাশভারী, পান থেকে চুন খসলেই বাড়ি মাথায় – বাবাও তখন দাদুকে ভয় পেত। কিন্তু মা কি সুন্দর হাসিমুখে সব সামলে দিতেন। চোখ বন্ধ করলে মনে ভাসে কপালে বড় সিঁদুরের টিপ পড়া মায়ের মুখখানি। বিয়ের পর কিছুদিন রোজ মায়ের সাথে কথা হত। কথা মানে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর নামে চুকলি করা, রঙ চড়িয়ে বেকার দেওরের বাউণ্ডুলেপনার নমুনা পেশ করা আর ননদের নামে গালমন্দ করা। মা বলতেন – “দেখ তুই এখন সুমিতের পরিবারের একজন। আমরা তো আছিই, থাকবও। কিন্তু তোর পদবিটা সুমিতের পরিবারের – তাই তাদের ভালমন্দ ভাগ করে নে। বাস্তবটা যত তাড়াতাড়ি মেনে নিবি তত ভাল।”

মাধবী বাস্তব মানে না, আবার কল্পনাপ্রবণও নয়। মাধবী চায় সব নিজের মত হোক – যা মন চায় তাই করবে। তাই সুমিতকে তিতিবিরক্ত করে, কানের কাছে বাড়ির সবার নামে নিন্দামন্দ করে শেষমেষ নিজের নামে গার্ডেন সিটির এই ফ্ল্যাটটা কিনতে একপ্রকার বাধ্যই করেছে। মা শুনে বলেছিল – "তুই যা বলিস সব সত্যি হলে ঠিক আছে। নাহলে কিন্তু কাজটা ভালো করলি না মা।" ধুর মা না কেমন যেন ব্যাকডেটেড। তবু মায়ের সাথেই সপ্তাহান্তে কথা হয়। অল্পকথাতেই ফোন শেষ, কারণ মাধবী কোনদিনই নিজের সবকথা অন্যকে খুলে বলে না বা বলতে চায় না। মাসচারেক যৌথ পরিবারে থেকে মাধবীর প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠেছিলো। সেই থেকে শ্বশুরবাড়ির দিকে পারতপক্ষে পা বাড়ায়নি। দেওর আর ননদের সাথেও এতটুকু সম্পর্ক রাখেনি যাতে ওরা মাঝেসাঝে এদিকে আসে। লোকজন বেশি আসলে যে মাধবীরই অসুবিধে।

কাকুমণি বলত – "মাধু দেখিস অপরকে ভালবেসে কত সুখ। নিজের লোক তো নিজেরই থাকবে – কিন্তু শুধু নিজের কথা ভেবে পথ চলিস না। সেই পথে যখন ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাবি দেখবি বড় দেরি হয়ে গেছে। আশেপাশে আপনার কেউ নেই।" কাকুমণির কথা এককানে শুনে অন্যকান দিয়ে বের করে দিয়েছিল। মায়ের কাছে শোনা প্রেসিডেন্সির ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রথম তিনের মধ্যে থাকা ছেলেটি ক্লাসেও খুব জনপ্রিয় ছিল আর প্রাণপ্রিয় ছিল এক সহপাঠিনীর। ঠিক ছিল কাকু চাকরি পেলেই দুজনে বিয়ে করে নেবে। কিন্তু এক পথ দুর্ঘটনায় মাধবীর সেই না হওয়া কাকিমা অকালে মারা যায়। কাকু নাকি তাই আর বিয়ে করেনি, একটা ছোটখাটো চাকরি জোগাড় করে, মাসের শেষে বৌদির হাতে মাইনেটা তুলে দেয়। ছাদের একটা ঘরে একগাদা বই আর একটা তানপুরা নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিল। নবীনকে খুব মনে ধরেছিল কাকুমণির। কাকুমণিই জানতো ওদের সম্পর্কটা শুধু বন্ধুর নয়। তাই ওদের একান্তে নিজের ঘরে আলাপ করার সুযোগ করে মাঝেমাঝে ছাদে পায়চারি করতেন। যেদিন মাধবী সুমিতকে বিয়ে করবে ঠিক করল সেদিন থেকে কাকুমণি মাধবীর সাথে কথাই বলেননি। বাইরের একটা ছেলের জন্যে এত দরদ দেখে

মাধবীর গা রি-রি করে উঠেছিল। বিয়ের পর পিতৃগৃহে গেলেও কাকুমণির ছাদের ঘরের পথ মাড়ায়নি।

দাদু ঠাকুমা আজ আর নেই। থাকলেও কি আজ মাধবীকে সেই ছোটবেলার মত প্রশ্রয় দিত? ছোটবেলায় যেমন মায়ের মারের ভয়ে এক দৌড়ে দাদু ঠাকুমার মাঝে গিয়ে লুকোত। মাধবী কি পারত আজ তেমনভাবে এক দৌড়ে সবার কাছ থেকে পালিয়ে লুকোতে? আসলে কেউ তো আজ তাকে তাড়া করছে না, কেউ তো নেই। সবাই তো আজ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। কেউ কি পারে নিজের কাছ থেকে নিজে লুকোতে? পারলে হয়তো মাধবী সেটাই করতো। এই হার তো নিজের কাছে নিজের হার, এই লজ্জা নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানোর লজ্জা। দাদু ঠাকুমা আজ থাকলে দেখে কষ্ট পেতেন, নাতনির এই পরিণতি দেখে। আচ্ছা মানুষ মরে গেলে নাকি আকাশের তারা হয়ে যায়। কাকুমণি সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে বলত, “ওই দেখ তোর কাকিমা। এতো ভালবেসে নিজে কেমন আমাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল।” আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল দুটো তারা যেন একটু বেশি উজ্জ্বল। ওই দুটো কি দাদু ঠাকুমা? মাধবীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলছে – “আয় দিদিভাই আয়, আমাদের কাছে এসে দেখ - এখানে কত শান্তি।” শান্তি কি মাধবীর প্রাপ্য? সে তো নিজেই কোনদিন কাউকে শান্তি দেয় নি।

৩.

তাড়াতাড়ি মা হবার ইচ্ছে মাধবীর ছিল না। মন চাইত পাঁচ-ছ বছর চুটিয়ে মজা করবে। স্বামী অফিসের কাজে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে অফিসের কাজে বাইরেও যায়। মাধবী এখন বোঝে বিয়ের আগে লুকিয়ে নবীনের সাথে মিলনের যে মাদকতা সেটা বৈবাহিক সম্পর্কে পাওয়া যায় না। প্রথম প্রথম মন একটু খুঁতখুঁত করলেও মনকে বুঝিয়েছে যে ভালবাসা কোনো কিছুর গণ্ডি মানে না। তাই একটা বয়ফ্রেন্ড থাকলে মন্দ হয় না – ওই একটু আধটু রোমান্স, সেই পুরনো মাদকতা।

মাধবীর এক বান্ধবী ওকে জ্ঞান দিয়েছিল যে – এসব ব্যাপারে বিবাহিত পুরুষরাই সবথেকে ভাল। বউয়ের কাছে যেসব চাহিদা পূর্ণ হয়না সেগুলো মিটিয়ে নেবার খিদে থাকে। সেই সঙ্গে বেশ অশ্লীল কথা বলে আর বন্য আচরণ করে – এগুলো মাধবীর মনপসন্দ। এখন তো ইন্টার্নেটে চ্যাট বা ফেসবুকে বন্ধু পাতানোর অঢেল সুযোগ। সেইমতো মাধবী ইন্টার্নেটের জগতে ছিপ ফেলে। অল্পদিনেই জুটে যায় এক আবিবাহিত সুঠাম পুরুষ – জিতেন্দ্র। অবিবাহিত শুনে প্রথমে মাধবী খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি – তবে কিছুদিন চ্যাট করে আর ভিডিওক্যামে ছবি দেখে প্রভাবিত হয়ে যায়।

যখন সুমিত বাইরে যায় বা বালিগঞ্জের বাড়িতে যায়, তখন মাধবী খুব একটা ফোন করে না। বরং বলে শরীর খারাপ তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ছে; আর নাহলে কোন বান্ধবী বা প্রতিবেশিনীর সাথে কোথাও শপিং করতে বা সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। একটা জিনিস মাধবীর ভালো লাগে, ইদানিং বাইরে থাকলে সুমিতও হঠাৎ করে সন্ধ্যের পর ফোন করে না। মানে মনে হয় যেন ওকে একটু বেশিরকম ব্যাক্তিগত সময় দেয়। তাই সুমিত বাইরে থাকলেই জিতেন্দ্রকে নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে নেয় চুটিয়ে বন্য মাদকতা উপভোগ করার জন্যে। কিন্তু কিছুদিনেই জিতেন্দ্রর উপর মন ভরে গেল মাধবীর – বাঘিনী একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে যে। আস্তে আস্তে অনেকেই এলো জীবনে। সবাইকে কি মাধবীর নিজেরই কি মনে পড়ে। নতুন পুরুষ নতুন উন্মাদনা – দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো কাটছিল।

বাবা বরাবরই ছিলেন একটু আদর্শবাদী। মায়ের কাছে শুনেছে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসার দিন বাবা নাকি কিছু খান নি। শুধু মাকে বলেছেন – “মেয়েটাকে যৌথপরিবারে থেকেও আমরা মানুষ করতে পারলাম না।” ভাই তাপস – এখন ডাক্তারি পড়ছে কলকাতাতেই। একবছর আগে একদিন এক পাঁচতারা হোটেল থেকে এক পুরুষসঙ্গীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে বেড়ানোর সময় হঠাৎ তাপসের মুখোমুখি। তাপস অবাক হয়েও অন্য বন্ধুদের সামনে চিনতে না পারার ভান করে এড়িয়ে

গিয়েছিল। মায়ের কাছে পরে শুনেছিলো তাপসের প্রেমিকা নাকি সেই হোটেলেরই কর্মচারী। ভাই আড়েঠাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সে মাধবীর সাথে যোগাযোগ রাখতে চায় না। হয়তো উৎসাহের বশে খোঁজ নিতে গিয়ে প্রেমিকার কাছ থেকে দিদির নামে অনেক কিছুই জেনেছে। মা দুঃখ করলেও মাধবী এসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ভালই হল – পিছুটান কম থাকলে মন খুলে নিজের মতো থাকা যায়।

বছর দুয়েক আগে ইন্টার্নেটেই যোগাযোগ হয় এক রইস বিল্ডারের সাথে। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, অনেকেই ছদ্মনামে চ্যাট করে। ঠিক হয় সামনের সপ্তাহে সুমিত ট্যুরে গেলে মাধবী নতুন বন্ধুর সাথে দেখা করবে। সেইমতো বন্ধুর ঠিক করা হোটেলের স্যুইটে ঢুকে প্রথমে চমকে গিয়েছিল। চিনতে অসুবিধে হয়নি প্রচণ্ড হট কিন্তু মাধবীর চোখে গুড ফর নাথিং পুরনো প্রেমিক নবীনকে। নবীন অবাক হলেও কাছে ডেকে নিয়েছিল প্রথম প্রেমিকাকে। কলেজে পড়ার সময় থেকে মাধবী নবীনের জীবনে আসে। বাস্তব মেনে সেই প্রেম গভীর হয়। আগুনের কাছে ঘি না গলে থাকতে পারে না। নবীন ওকে শরীর আর মন দিয়ে ভালোবেসেছিল। কমার্স নিয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শেষ হবার আগেই একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলে। ঠিক ছিল পরীক্ষা শেষ হলেই একটা ছ'মাসের প্রশিক্ষণ নিতে যেতে হবে বেঙ্গালুরু। ফিরে এসেই কলকাতা অফিসের জুনিয়র পারচেজ ম্যানেজার। যদিও মাইনে শুরুতে খুব বেশি নয়, তবে দুজনের সংসার টেনেটুনে চলে যাবে। নবীন ভেবেছিল বেঙ্গালুরু থেকে ফিরে এসে দুজনের অভিভাবকদের নিজেদের সম্পর্কের ব্যাপারটা জানাবে। মাধবী ঠিক ভালোবেসে একটু একটু করে গড়ে তুলবে ওদের সংসার। খুশিতে ডগমগ হয়ে মাধবীকে খবরটা দিতে, মাধবী চুপ করে যায় মাইনের অঙ্কটা শুনে। এদিকে নবীনের সাথে সম্পর্কটা না জেনেই মাধবীর বাবা-মা ওর বিয়ের চেষ্টা করছেন। অনেক বড়লোক ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী পাত্রের সম্বন্ধ আসছে। তাই নবীনের সাথে ঘর বেঁধে এতো কষ্ট করার কোন মানে হয় না। মাধবী ঠিক করলো এবার ছুটি দিতে হবে নবীনকে।

৪.

তিনমাসের মাথায় বেঙ্গালুরুতে বসেই নবীন খবরটা পেয়েছিল। জীবনটা থমকে গিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাও একদম চলে গিয়েছিল। তবে কথায় বলে সব খারাপ সময়েরই শেষ আসে। বাড়ির কথা ভেবে আর কিছু অসময়ের বন্ধুর সহায়তায় নবীন অবশেষে সামলে ওঠে। বেঙ্গালুরু থেকে ফিরে এসে কিছুদিন পরে শুরু করে প্রোমোটারি ব্যবসা। অচিরেই লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টিতে ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠে। নবীনকে এখন মধ্যমগ্রাম-বারাসাত অঞ্চলে সবাই একডাকে চেনে। কলকাতার বিভিন্নপ্রান্তে বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাট ছাড়াও মধ্যমগ্রামে দশবিঘা জমির উপর বিশাল দোতলা বাড়ি – ড্রাইভার, চাকরবাকর, সহকারী। কিন্তু বিশাল সম্পত্তি মালিকে হলেও নবীন বিয়ে করেনি। মাধবীর বিশ্বাসঘাতকতার পর কোন মেয়েকেই আর বিশ্বাস হয় না। শরীরের প্রয়োজন পড়লে সংবাদপত্র থেকে কোনো নাম্বারে বা ইন্টার্নেটে যোগাযোগ করলেই হল।

সেই সন্ধ্যেতেও একরাতের জন্যে বুক করা পাঁচতারা হোটেলের স্যুইটে হঠাৎ মাধবীকে ঢুকতে দেখে চমকে উঠেছিল। মাধবী কি তবে বিবাহিত জীবনে অসুখী? ভাগ্যের প্রতিশোধের কথা ভেবে মনে মনে একটা তৃপ্তির হাসি হাসল। পুরনো প্রেমিকার সাথে আলাপচারিতায় অচিরেই ভুল ভাঙল। এটা মাধবীর নেশা – বিবাহ বহির্ভূত গোপন অভিসার। যাক ভগবান ভালই করেছেন। এরকম বউ হলে তো নবীন মেনে নিতে পারত না। যাইহোক সমস্ত অভিমান, দ্বিধাদ্বন্দ্ব সরিয়ে তরল পানীয়ের নেশায় হোক বা শারীরিক চাহিদার কারণেই হোক, কিছু পরেই দুজনে দুজনের মধ্যে হারিয়ে গেল। পুরনো চাল ভাতে বাড়ে বলেই হয়ত – আস্তে আস্তে দুজনের দেখাসাক্ষাৎ নিয়মিত হতে শুরু করল। মাধবীও নবীনের সঙ্গ পাবার জন্যে আবার আগের মত উৎসুক হতে লাগল। এরমাঝে সুমিতের অফিসের ট্যুরের সাথে মিলিয়ে দুজনে অল্পদিনের জন্যে টুকটাক ঘুরেও এলো – কলকাতার বাইরে এমনকি দেশেরও বাইরে। একবার মন্দারমনি ঘুরতে গিয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটল। ওখানে হোটেলগুলোর সামনে একটা করে ছোট ছাউনি থাকে। ঘুরতে আসা বন্ধুবান্ধবের বা

যুগলদের নিরিবিলিতে বসে জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের রূপ দেখতে দেখতে সুরাপান করার ও একটু অন্তরঙ্গ হবার জন্যে। ওরা সেবার যে হোটেলটায় ছিল তার ছাউনিতে বসে এদিক ওদিক দেখতে গিয়ে হঠাৎ নজর পরে অদূরের অন্য একটা হোটেলের ছাউনির দিকে। মাধবী চমকে ওঠে পুরুষটিকে সুমিত ভেবে। সঙ্গের নারীটি কে? তারপরই মনে পড়ে ভুল ভাবছে, কারণ সুমিত তো আজ ভোরের ফ্লাইটে মুম্বই যাচ্ছে বলে বেরিয়েছে। তবু একটু হলেও ঘাবড়ে গিয়েছিল। কে জানে – ধরা পড়ার ভয়ে না ধরে ফেলার ভয়ে?

মাধবীর কাছে পুরুষমানুষের মন কিংবা শরীরের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সামর্থ্য। মনের মধ্যে বেশ টের পায় নবীনকে এককালে ছেড়ে যাবার পিছনে মূল কারণ ছিল অর্থ। কালেচক্রে এখন আবার নবীনকে বেশি করে ভালোলাগার কারণও সেটাই। মাঝেমাঝে মনে হয় সুমিতের সাথে পাকাপাকি ডিভোর্স করে নবীনের সাথে ঘর বাঁধলে কেমন হয়। নবীনের এখন বিশাল পয়সা। ওর মধ্যমগ্রামের বিশাল প্রাসাদে চাকরবাকর দাসদাসী নিয়ে দারুণ কাটবে বাকি জীবনটা। অনেক দুর্বল মুহূর্তে সেটা বলেওছে নবীনকে। কিন্তু বুঝতে পারেনি নবীন সেই ভাবনাগুলোয় সায় দিয়েছে শুধুমাত্র কামনার বশে। কে জানে হয়তো মাধবীকে আরও দুর্বল করে আঘাত দেবার জন্যেই নবীন ওর একসাথে ঘর বাঁধার ভাবনাগুলোকে সমর্থন করে গেছে। হয়তো বা চেয়েছিল মাধবী উপলব্ধি করুক সাতবছর আগে নবীনের কিরকম অবস্থা হয়েছিল।

৫.

তবু হয়তো নবীনের প্রত্যাখ্যানে মাধবী এত ভেঙে পড়ত না। কিন্তু আজ বাড়ি ফিরে একটা চিঠি সব পাল্টে দিল –

মাধবী,

তোমাকে একটা কথা সামনাসামনি বলবো ভেবেছিলাম। বালিগঞ্জে আমাদের পাশের বাড়ির বাল্যবিধবা রমলাকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়। আমরা গার্ডেন সিটির ফ্ল্যাটে চলে আসার পর থেকে তুমি তো বালিগঞ্জের বাড়ির সাথে কোন যোগাযোগই রাখনি। আমিও অফিসের কাজে ব্যস্ত, ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেলে। বোন কিছুদিন পর একটা চাকরি পেয়ে মালদা চলে যায়। তখন রমলাই বিপদ আপদে বাবা মায়ের দেখভাল করত। সেই সূত্রে আমার মনেও ওর জন্য একটা দুর্বলতা তৈরি হয়। আস্তে আস্তে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। যদিও আমার মনে প্রথমে একটা পাপবোধ কাজ করত।

কিছুদিন আগে মুম্বই যাব বলে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে রমলাকে নিয়ে গেলাম মন্দারমনি। রাতে হঠাৎ নজরে পড়ল পাশের হোটেলে এক পরপুরুষের সাথে তুমি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। বুঝতে বাকি রইল না আমি বাইরে গেলে বা বালিগঞ্জের বাড়িতে এলে তুমি কেন খুব একটা খোঁজখবর নিতে না। এমনকি মনে হত তুমি একটু খুশিই হতে। এরমধ্যে একদিন তাপসের সাথে দেখা। ওর কাছেও অনেক কিছু জানতে পারলাম তোমার সম্বন্ধে। এও জানলাম সেই পুরুষটি তোমার পুরনো প্রেমিক। মনের মধ্যে পাপবোধ চলে গিয়ে জন্ম নিল একটা তীব্র ঘৃণা।

যাইহোক আজ তোমার মুখোমুখি হব বলেই অপেক্ষা করছিলাম। হয়তো আমি সত্যি সত্যি দিল্লি গেছি ভেবে তোমরা গোপন অভিসারে গেছ। তোমার ফোনও অনেকক্ষণ সুইচড অফ। আমি আর রমলা ঠিক করেছি একসাথে ঘর বাঁধব। তোমাকেও মুক্তি দিয়ে গেলাম। আমার উকিল মিউচুয়াল ডিভোর্সের কাগজপত্র তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সই করে দিও। এই ফ্ল্যাটটা তোমার নামেই ছিল, আমি গাড়িটাও তোমার নামে করে দিয়েছি। তোমার নামে একটা পঞ্চাশলক্ষ টাকার চেক আর বাকি কাগজপত্র আলমারির মধ্যে রইল। ভালো থেকো।

বিদায়, সুমিত

হোটেলে একটি রাত

দেবুমু

রাত তখন প্রায় এগারোটা বাজবে বাজবে করছে। হোটেল রিসেপসনের ভদ্রলোকটি রেজিস্টারের পাতা উল্টোতে উল্টোতে বললেন - নাহ, কোনো ঘর খালি নেই। এত রাত্তিরে তো আর কোন উপায়ও দেখছি না। ওঁর হাতের আঙ্গুলের ওপরে চোখ পড়ল। দেখলুম, ওঁর ডানহাতের নখগুলো সব দাঁতেখোঁটা। কাঁধ নাচিয়ে আমায় এই কথাটা জানানোর সময় আরও লক্ষ্য করলুম যে, ওঁর পরনের খাটো খাটো জ্যাকেটটা দুই বগলের নীচে প্রায় ফাটো ফাটো করছে ।

ভদ্রলোকটি বলেই চললেন,

- অন্য কোথাও গিয়ে যে আস্তানা পাবেন, তারও অবশ্য কোন গ্যারান্টি নেই। নেবেন কি নেবেন না, তা একান্তই আপনার মর্জি। তবে হ্যাঁ, পরে কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এলে, এই ডবল বেডরুমের খালি বেডটাও যে খালি থেকে যাবে, তাও আপনাকে হলফ করে বলতে পারি না।

- না, না, এত রাত্তিরে আর কোথাও গিয়ে খোঁজাখুঁজি করব না। ওই খালি বেডটাই তাহলে দিন। তবে আমারও একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আচ্ছা, ঘরে যিনি আছেন তিনি কেমনতর লোক বলুন তো। উঁহুহু, অজানা, অচেনা কোনো লোকের সঙ্গে একঘরে একরাত কাটাতে হবে বলে ভয় পেয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করছি না। ওসব ভয়ডর বলে আমার কিছু নেই। আসল কথাটা কি জানেন, এক ঘরে যাঁর সঙ্গে একটা রাত কাটাবো, তাঁকে তো বন্ধু বলে মনে করতে কোনো বাধা নেই। তাই ওঁর সম্বন্ধে আগেভাগে কিছু জানা থাকলে... আচ্ছা, উনি কি এখন ঘরে, না বাইরে বেরিয়েছেন অন্য কোথাও, হাওয়া খেতে...?

- ঘরেই আছেন । বোধহয় ঘুমুচ্ছেন।

ঘুমুচ্ছেন, কথাটা নিজেও মনে মনে একবার আওড়ালুম। এবং কেন জানিনা বেশ চিন্তায়ও পড়ে গেলুম। অন্য আর কোনও উপায় যখন নেই... কি আর করা যাবে! ভর্তিকরা ফর্মটায় সই করে ওঁর হাতে দিয়ে দিলুম। চাবি হাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলার দিকে যাবার সময় মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি উপলব্ধি করছিলুম। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন আমাকে একেবারে চোখকান বুজে কোন এক পুরোনো পরিত্যক্ত কুয়োর ভেতর ঝাঁপ বলছে। ওপর থেকে যে কুয়োর তল দেখা যাচ্ছে না, যার গভীরে জড়িয়ে আছে শুধু এক রহস্যময় ঘন অন্ধকার।

যতই ঘরের কাছাকাছি হচ্ছি ততই আমার চলার গতি কমতে থাকে। কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে কোনও না কোনও আওয়াজ শোনার চেষ্টা করি। দরজার চাবির গর্তে চোখ লাগিয়ে ঘরের ভেতরে দেখার চেষ্টা করি। ঘর অন্ধকার। এও তো হতে পারে, হয়ত ইচ্ছে করেই ভদ্রলোক চাবির গর্তটা কিছু দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন, যাতে বাইরে থেকে কেউ না দেখতে পায়, উনি ঘরের ভেতর কি করছেন। হয়তো বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার আগে কোন বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছেন, অথবা জামাকাপড় ছাড়ছেন। সিঁড়িতে হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে কি যে করি ভেবে পেলুম না। তবু এমন একটা ভাব দেখানোর চেষ্টা করি, যেন ভুলে এই দোতলায় উঠে নির্দিষ্ট ঘর খুঁজতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আর অন্য উপায়টি হল সটান দরজাটা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে যাওয়া। এই দুই-বিছানার ঘরের একটা বিছানাটায় এক অচেনা মানুষ ইতিমধ্যেই জাঁকিয়ে বসেছেন। কিন্তু ওপর বিছানাটি তো আমার জন্যেই বরাদ্দ।

দরজার হাতলে চাপ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। খিল দেওয়া ছিল না। তবে ঘুরঘুটে অন্ধকার ঘর। দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে আলোর সুইচটা খোঁজার চেষ্টা করতে গিয়ে বাধা পেলুম। বুকটা ঢিপঢিপ করছে।

- আরে মশাই, করেন কি, করেন কি? ফট্ করে আলোটা না জ্বাললে কি চলে না নাকি?

- অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। আপনি এটা বলার জন্যেই এতক্ষণ জেগে বসে আছেন নাকি? আর কি করেই বা জানলেন যে, আমি আসব?

আমার প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে অন্যজন বললেন, সাবধান, মেঝের মাঝখানে রাখা সুটকেস আর ক্র্যাচে পা আটকে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়বেন না।

- অন্ধকারে কি করে জানবো কোথায় আপনার ক্র্যাচ ? আর আমার বিছানাটাই বা খুঁজে পাবো কি করে ?

- ওসব অত জানার কোন দরকার নেই। আমি যেমন যেমন বলছি তেমন তেমন এগোন। আপনি দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন তো? তাহলে এবার ডানহাতি দেওয়ালটা ধরে তিন পা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে ফিরুন। ফিরেছেন?

- হ্যাঁ। এবার?

- সামনের দিকে হাত বাড়ান। কি? খাটের ব্যাটনটা হাতে ঠেকেছে?

হ্যাঁ, বলে ধন্যবাদ জানিয়ে জামাটামা খুলে সটান বিছানায় শুয়ে চাদর মুড়ি দিলুম। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকেও ঘুম আসতে চাইল না। পাশের ভদ্রলোকও ঘুমোতে পারছেন না, একটানা

হাঁসফাঁস নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে যেন কিছুতেই স্থির হতে পারছেন না। একনাগাড়ে এপাশ ওপাশ করায় নড়বড়ে খাটের এক বিকট ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

- এই যা, আমার পরিচয়টাই দিতে ভুলে গেছি, আমার নাম...

কিন্তু নামটা বলার আগেই বাধা পেলুম,

- ওসব নামধাম জেনে কি হবে? শহরে কি করতে? কোন মিটিংফিটিং নাকি?

- না। আপনি?

- না।

- তাহলে? অফিসের কোনো কাজে?

- ওই একরকম হল আর কি, অফিসের কাজে ঠিক বলা যায় না।

- আমি যে কারণে এসেছি সেটা কাউকে বললে, বলবে লোকটার মাথায় নিশ্চয়ই...

হোটেলের পাশে মালগাড়ির অনবরত লাইন বদল আর নতুন বগি জোড়ার বিকট শব্দ আসছে। ভূমিকম্পের মতো সারা হোটেলটাই ঢকঢক করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে যেন কেউ গোটা বিছানাটাকেই ধরে এদিক ওদিক নাড়াচ্ছে।

- ছিট আছে ? আরে মশাই, লোকে কি বলল না বলল তাতে কি এসে যায়? এই শহরে যখন এয়েচেন তখন নিশ্চয়ই কোন না কোন কারণ একটা আছেই, বিনা কারণে কেউ তো আর কোথাও যায় না। না কি, আত্মহত্যা-ফত্যা করতে এয়েচেন শহরে?

- আরে না, না। আত্মহত্যা করতে যাবো কেন? আমায় দেখে সেরকম কিছু মনে হচ্ছে নাকি?

- দেখব আর কি করে? ঘর তো অন্ধকার।

উত্তর দেবার আগে একবার গলাখাঁকারি দিলুম, তারপর স্বাভাবিক গলায় বলার চেষ্টা করি। জানেন, মশাই, আমার ছেলে..... মনমরা হলেও বেশ চটপটে। ওর জন্যেই শহরে আসতে হল।

- কেন? হাসপাতালে ভর্তি করেছেন?

- না, না। অসুখ বিসুখ কিছু নয়। চটপটে ছেলে হলে কি হবে, কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি, ও ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরে মনমরা হয়ে, ভেবেছি ইস্কুলে পড়া পারেনি তাই হয়ত বকাঝকা খেয়েছে। কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তরই দেয় না। দিনের দিন কেমন যেন লজ্জাবতী লতার মতো হয়ে যাচ্ছে। গায়ে ছায়া লাগলেই কেমন যেন কুঁকড়েফুঁকড়ে যায়।

- তাহলে হাসপাতালে দিচ্ছেন না কেন?

- বললাম তো আমার ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ। হাসপাতালে দিতে যাব কেন? তবে কি জানেন, ওর মনটা একেবারে ঠুনকো কাঁচের মতো। একটু টোকা লাগলেই যেন খানখান হয়ে যাবে।

- বিষ দিলেই তো পারেন, সব জ্বালা উপশম হয়।

ফুটনি কাটেন অন্যজন।

- এসব কি বলছেন আপনি, কচি, দুধের বয়সের ছেলে। বালাই ষাট, বিষ দিতে যাবো কেন? এসব কি অলক্ষুণে কথা বলেছেন আপনি? আসল ব্যাপারটা কি জানেন, প্রত্যেকদিন সকালবেলা ও যখন ইস্কুলে যায়, রেললাইনের ক্রসিংটার কাছে পৌঁছলেই দেখে গেটটা বন্ধ। তাই অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তরই থাকে না। তারপর এসে পড়ে সকালের ট্রেনটা। আর ট্রেনটা এসে

পড়তেই শুরু হয়ে যায় আকুল উল্লাসে আর উৎসাহে ওর হাত নাড়া। কিন্তু ট্রেনটা পার হয়ে যাবার পর, ও প্রতিদিনই কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যায়।

- তো কি?

- তারপর ও ইস্কুলে যায়। ইস্কুলে কেমন কাটে বলতে পারব না, কিন্তু বাড়ি ফিরলেই দেখতে পাই, ও দিনের দিন কেমন যেন মনমরা হয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছুতেই ওর ঠিকমতো মন বসে না। না খাওয়াদাওয়ায়, না লেখাপড়ায়। অন্য ছেলেদের সঙ্গে হই-হুল্লোড় করে খেলতে যেতেও চায় না। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পাওয়া যায় না। আমাদের ছেলেটার যে কি হয়েছে কে জানে!

- এ রকম হাবভাবের কারণটা কি হতে পারে । প্রেমেট্রেমে পড়েনি তো?

- আরে না, না। প্রেমে পড়ার বয়সই হয়নি।

- আপনি বলছেন ? আজকাল যে কি হয় না হয় কিছুই বলা যায় না আগে থেকে, সবাই কেমন যেন দিন দিন এঁচোড়ে পেকে যাচ্ছে।

- আমার ছেলেটা প্রতিদিনই ট্রেন দেখলে উৎসাহে হাত নাড়ায়, কিন্তু কোনোদিনই কেউ ট্রেনের ভেতর থেকে তার প্রত্যুত্তর দেয় না। দিলে হয়ত ছেলেটা রোজ রোজ এমন মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরত না। আইন করে তো আর কাউকে বাধ্য করা যায় না যে ট্রেনের যাত্রী হলেই খেয়াল রাখতে হবে, ট্রেনের বাইরে থেকে কেউ হাত নাড়াচ্ছে কিনা, হ'লে হাত নাড়িয়ে প্রত্যুত্তর দিতে হবে। নইলে জরিমানা। এমন কোন আইনের কথা তুললেই লোকে হেসে উড়িয়ে দেবে।

- তাই আপনি কাল যাত্রী সেজে সেই দায়িত্ব পালন করে আপনার ছেলেকে কৃতার্থ করবেন বলে ভেবেছেন ? কিন্তু সেটা তো জেনেসুজে চিটিংবাজি করা হয়ে যাবে। দেখুন, যদিও ছেলেপুলে আমার চক্ষুশূল, তবু এই ধরণের প্রতারণার কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না।

- চক্ষুশূল কেন?

- কারণ ওই একটা সন্তানের আশায় আমি আমার স্ত্রীকে হারিয়েছি, প্রসবকালে ওর মৃত্যু হয়।

- শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না, আমি আর আপনার শান্তি ভঙ্গ করবো না।

জানলা দিয়ে এক ঝলক শীতল হাওয়া ঘরে ঢুকতেই কেমন যেন চোখের পাতা জুড়ে আসতে চাইল। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে এবার ঘুমোবার চেষ্টা করলুম।

পাশের বিছানার ভদ্রলোকটি আর একবার আমার গন্তব্যস্থল জানতে চাইলেন। উত্তর দিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম খেয়াল ছিল না। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে ঘড়ির দিকে তাকাতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ট্রেন ছাড়তে হাতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। যতই তাড়াহুড়ো করি না কেন, ট্রেনটা ধরা অসম্ভব। আর একটা দিন যে থেকে যাব, তেমন পয়সাও হাতে নেই। মনমরা হয়ে পাশের বিছানার দিকে তাকালুম। বিছানা ফাঁকা। নিপুণ হাতে এমনভাবে সাজানো গোছানো, যেন কেউই ওই বিছানায় শোয়নি গতকাল।

হোটেল থেকে পায়ে হেঁটে গ্রামে ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল, এ কি কুঁড়েমি, একটা দিন তুই সময়মত ঘুম ভেঙে উঠতে পারলি না। শহরে এসে ফালতু পয়সা খরচ করলি, কাজের কাজ কিছুই হল না।

ছেলে দরজা খুলে দিল। ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। খুশিতে একেবারে ডগমগ করছে। আমায় বিমর্ষ দেখে উল্টে বললে – "এ কি বাবা, তোমার মুখটা এমন গোমড়া কেন আজ ?" ও আমায় কত কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু কিছুই যেন আমার কানে পৌঁছচ্ছে না। হঠাৎ যখন ছেলের মুখে শুনলুম, আজ ও ট্রেন থেকে সাড়া পেয়েছে, তখন ভেবে পেলুম না কি করি। বাঁকের কাছে ট্রেনটা

অদৃশ্য হওয়া অবধি নাকি কে যেন ঘন ঘন রুমাল নাড়িয়ে তার হাত নাড়ানোয় সাড়া দিয়েছে। জিজ্ঞেস করলুম শান্ত গলায়, রুমালটা কি একটা ক্র্যাচে বাঁধা ছিল ?

ছেলে উত্তর দিলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি করে জানলে, বাবা ?

* এই গল্পটি প্রথিতযশা জার্মান সাহিত্যিক সিগফ্রিদ্ লেনৎস (জন্মঃ ১৭ই মার্চ ১৯২৬) লিখিত "die Nacht im Hotel" এর ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায় না, নিজের মতো করে সাজিয়ে পরিবেশন করলাম।

বইমেলায় সত্যিকারের কৌতুক

অদিতি কবির

প্রতি বছর ঢাকায় অমর একুশে স্মরণে বইমেলা হয়। এ বছর আমি চর্যাপদ নামের একটা লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে সপ্তাহ তিনেক বসেছিলাম। কত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তা বলার মত নয়। তার থেকে অবকাশের পাঠকদের জন্য কয়েকটা।

বইমেলা ঘটনা- ১

আমার পাশের স্টলে হিহি করতে করতে ৪/৫টা ছেলে আসল, এসে বেশ দেখেশুনে ভালবাসা সংক্রান্ত কি একটা সংকলন কিনল। তারপর ঐ স্টলের পাশেরটায় গিয়ে বই নেড়েচেড়ে একটা কবিতার বই বেশ পছন্দ করল, কারণ ঐ বইয়ের শুরুতে নাকি খুব সুন্দর একটা কবিতা আছে। এটা নিতে চায় তারা। এরপর আমার পাশের স্টলের মেয়েটাকে বলল - আপনি এই বইটা ফেরত নেন, আমরা ঐ বইটা নেব। বেচারা অপমানিত হলেও কিছু না বলে বই ফেরত নিয়ে টাকা ফেরত দিল। ছেলেগুলো ঐ বইটা কিনে পড়তে পড়তে কিছুদূর গেল - আমরা দেখছি সবাই। হঠাৎ দেখি ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর বইটাসহ ফেরত এসে ক্ষিপ্ত স্বরে বলল - এইটা কি বই! পয়লা কবিতাটা এত ভাল। ভিতরেরগুলা এইরকম ক্যান?? স্টলের ছেলে - আরে ঐ কবিতা তো রবীন্দ্রনাথের আর বই তো আরেকজনের। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়া এই কবি ফিলিং দিছেন। এবার ছেলেগুলো আবারও বই বদলে প্রথমটা নিয়ে গেল।

বইমেলা ঘটনা-২

এক মাওলানার পোশাক পরা লোক, তার বউ আর মেয়ে নিয়ে পাশের স্টলে দাঁড়াল, কি কি জিজ্ঞেস করল। তারপর আমার স্টলের সামনে এল। বইয়ের ওপর চোখ বুলিয়ে-

মাওলানা - এ কি সাহিত্যের বই ?

আমি - জ্বী।

মাওলানা - কেমন সাহিত্য?

আমি - আপনার কাছে একরকম লাগবে, আমার কাছে আরেক রকম। সাহিত্য তো এইরকমই।

মাওলানা - এ ইসলামী সাহিত্য না?

আমি তো পুরাই বেকুব! আমার স্টলের বইগুলির নাম গরহাটবার, কুসুমিত ইস্পাত আর প্রফেসর ডয়েলের মস্তক। গরহাটবার লেখক প্রবীর পাল।

বইমেলা ঘটনা-৩

স্বামী-স্ত্রী-শালী মেলায় এসেছে। দুলাভাই খালি হ্যা-হ্যা করে। যাই হোক আমার স্টলের সামনে এসে বই দেখছে, দুলাভাই বলে - ছোট গিন্নি, বই ন্যাও। শ্যালিকা পছন্দ করে কুসুমিত ইস্পাত। দুলাভাই দাম শুনে আমার সামনেই বলে - আরে যে বই একশ টাকার উপরে সেগুলাতে শুধু পাতা ভরা থাকে, আর কিছুই থাকে না। এই বলে শালীকে পাশের দোকান থেকে পঁচাত্তর টাকার বই কিনে দিল। শ্যালিকা নিতে চায়না, কিন্তু জামাইবাবু কি ঠেলাঠেলি! শালীর হাতে বই জোর করে গছিয়ে দুলাভাই হ্যা হ্যা করে কদ্দূর এগিয়ে গেল। বোন তাকে সান্ত্বনা দেয় - আমি তোকে কালকে আবার মেলায় এনে হুমায়ুন আহমেদের বই কিনে দেব। ছোট বোন রেগে জবাব দেয় - সে তো তুমি দিবা। দুলাভাই এইভাবে দিবে বলে তারপর দেয় না। আমাকে সরি বলে দুই বোন এগিয়ে যায়।

বইমেলা ঘটনা-৪

মা একদিকে স্টল দেখছে, বাবা আরেকদিকে। বাচ্চা পড়েছে আমার ভাগে। প্রথমে ছোট্ট সাইজের চর্যাপদ হাতে নিয়ে বলে -

- আন্টি, এই ছোট্ট বইটা কি বাবুদের?

- না, সোনা। ওটা বড়দের।

- ছোট কেন?

- পকেটে রাখার জন্য।

বেচারা একটু দমে গেল। এবার প্রফেসর ডয়েলের মস্তক-এর পাতা ওল্টাচ্ছে। ইলাস্ট্রেশন দেখে জিজ্ঞেস করল -

- আন্টি, এখানে কি হয়েছে ?

- ঐ লোকটার শরীর নেই, শুধু মাথা।

আগের একটা পৃষ্ঠায় অ্যালেকজান্ডার বেলিয়ায়েভের ছবি দেখিয়ে -

- আন্টি, এই লোকটাই কি ঐ লোক?

- না বাবা। উনি মারা গেছেন।

- মুক্তিযুদ্ধে?

এর মধ্যে পিচ্চির মা-বাবা বই কিনে তাকে চলতে বলল। পিচ্চি শক্ত করে বইটা ধরে রেখেছে। সে এটাই নেবে। ডোরেমনের বই না, সে এটাই নেবে। তার জেদের কাছে মা-বাবা পরাজিত হয়ে বইটা কিনে নিয়ে গেল।

বইমেলা ঘটনা-৫

বসন্তদিনের সাজে এল এক ড্রইংরুমবিহারিনী ও তার সঙ্গী। মেয়েটির পরণে নরম সিল্কের শাড়ি, ছেলেটি কোরাসিল্কের ওপর এপ্লিকের কাজ করা পাঞ্জাবি পরা। আমার স্টলের সামনে বই দেখছে

- এ বইটার দাম কত?

- ১৫০ টাকা।

- কম কত?

- ২৫% কম দিয়েই এত।

- ও। এইটা?

- একশ।

- কি দাম ! ঐটা?

- এটাও দেড়শ।

- উফ কি দাম। ২৫% এর বেশি দ্যান না।

- সরি আপু পারছি না।

মুখ বাঁকাল মেয়েটি। ছেলেটি একটা সামান্য পত্রিকা উল্টিয়ে দেখছিল। দাম জিজ্ঞেস করল।

- দশ টাকা।

- ৮ টাকায় দিতে পারবেন?

দু'জনের কাপড়ের দাম কমপক্ষে সাড়ে ৪ হাজার টাকা।

বইমেলা ঘটনা ৬

স্টলে এলেন এক টিচার, সঙ্গে ৩ ছাত্র। কিসের টিচার বোঝা গেলনা - প্রাইভেট না স্কুল। টিচার চর্যাপদের সামনে এসে কোন ভূমিকা না করে একটা চর্যাপদ তুলে নিল, সংখ্যা নং আঠেরো। তারপর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন – "শোন চর্যাপদ আবিষ্কার হবার আগে কেউ বাংলায় কথা বলতে পারত না। আজকে আমরা যে বাংলা কথা বলি এ সবই চর্যাপদের কারণে। এতে চল্লিশ/পঞ্চাশটা কবিতা ছিল, সব দশ লাইনে লেখা..." এরপর পাতা উল্টিয়ে যে কবিতাটা বের করল, সেটা ঠিক দশ লাইনের ! শিক্ষক কিছু দূর পড়ে দেখে ভাষা কেমন যেন, বললেন – "আধুনিক ভাষায় এগুলি করেসে..." মলাটে দেখল লেখা আঠেরো। আমার দিকে ফিরে এবার জিজ্ঞেস করল – "আসসা ম্যাডাম, এখানে তো দেখছি আঠারো লেখা, আগেরগুলো কই?" আমি এতক্ষণ তামাশা দেখছিলাম। বললাম - ভাই এটাতো সে চর্যাপদ না এটা আধুনিক কবিদের পত্রিকা।" ছাত্ররা হাসতে শুরু করল।

বইমেলা ঘটনা ৭

স্টলে ড. সুলতানা নাজনীনের ভ্রমণ কাহিনী ‘আঁচল ভরা ফুল’ ছিল। এক ক্রেতা বইটা দেখে রেখে গেছেন, আমি ওটা না গুছিয়ে কি যেন খুঁজছি। এমন সময় স্টলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক দম্পতি। মহিলা হঠাৎ বইটার উপরে ঝুঁকে পড়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল -

মহিলা - এই দেখো দেখো।

পুরুষ - কি দেখব ?

মহিলা - বইটা দেখো না।

পুরুষ - দেখার কি আছে ?

মহিলা - আমাকে কিনে দাও এটা।

পুরুষ - (বিরক্ত হয়ে) না দেব না। তুমি বই পড় না। শুধু শুধু কেনার মানে হয় না।

মহিলা - প্লিইইজ দাও না। আমি সবাইকে এটা দেখিয়ে বলব আমার লেখা।

বোঝা গেল মহিলার নামও সুলতানা নাজনীন। ভদ্রলোক স্ত্রীর কথায় হতভম্ব হয়ে গেলেন। মলাটে লেখিকার ছবি আছে। সেটা দেখিয়ে উনি বললেন - এটা তো যিনি লিখেছেন মনে হয় তার ছবি।

মহিলা - হোক, আমি ম্যানেজ করে নেব।

পুরুষ – আরে! তুমি কি ডক্টরেট? এখানে তো লেখিকার নামের আগে ডঃ আছে!

মহিলা - বললাম তো ম্যানেজ করে নেব। দাও না!

চরম বিরক্ত মুখে ভদ্রলোক বইটা কিনে নিলেন। আমি আর বললাম না যে, বইয়ের ভেতরে লেখিকার স্বামী ও সন্তানের ছবি আছে।

ঠাণ্ডা হওয়ার আয়োজন

প্রত্যয়দীপ্ত রুদ্র

প্রবল গরমে সবার প্রাণ আইঢাই। অথচ বাঙালির জিভ বলে কি খাই কি খাই!

এদিকে সূর্যদেবতা এমন দারুণ অগ্নিবাণ হেনেছেন, ভালমন্দ খাবারও জো নেই। হজম-ব্যবস্থা বিট্রে করে দেবে। ছান-টান করে পান্তাভাত সাপ্টে খেয়ে ঘুম লাগাতে ভালই লাগে, কিন্তু সেও বা আর কদিন। আপনাদের কথা জানিনা, আমার তো ক'দিন একই রকম খাবার দাবার খেলেই খাওয়ার প্রতি অরুচি জন্মে যায়। সুতরাং রান্নাঘরে গমন এবং এটা সেটা মিক্স করে বিবিধ রন্ধন!

আজ শোনাব দুটি খাবারের কথা। এগুলো খেলে আর যাই হোক গরমের দিনে পেট গরম হবার ভয় নেই। অথচ খেতেও সুস্বাদু। তাই এবারের গ্রীষ্ম শেষ হবার আগে চেখে দেখুন একবার এদের।

১.

প্রথমটি বহুল প্রচলিত এক রান্না, খেতে এতই ভাল হয় যে না জানলে বিশ্বাস করতে চাইবেন না এটা বানানো এত সহজ। এটি আর কিছুই না, লাউ শুক্তো। এর জন্যে উপকরণও লাগবে খুব সামান্য। একটি মাঝারি সাইজের লাউ, গোটা দুয়েক করলা (অথবা খান চার-পাঁচ উচ্ছে), ফোড়নে দেবার জন্য কিছু গোটা সরষে, বিউলির ডালের বড়ি, অল্প দুধ, আর এক চামচ আদা বাটা। আর নুন চিনি তো লাগবেই। একদম ঠিক ঠিক পরিমাণ বলতে আমি কখনই পারি না, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, তবে রান্নাবান্না করার সামান্য অভিজ্ঞতা থাকলেও পরিমাণের ভুলচুকে রান্নাটা কেঁচে যাবার সম্ভাবনা কম।

প্রথমেই উচ্ছেগুলো চাকা চাকা করে কেটে ভেজে নিন মাঝারি রকম কড়া করে। ভাজা উচ্ছে তুলে রাখুন। একই রকমভাবে ভেজে তুলে নিন বড়িগুলোও। এবার কড়ায় তেল গরম করে সরষে ফোড়ন দিন। তার মধ্যে দিন লাউ এর টুকরো। লাউ এর টুকরোগুলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড় করে কাটা হবে, কিন্তু বেধ হবে কম, অর্থাৎ পাতলা স্লাইস। অল্প কিছুক্ষণ নেড়ে তারপর আদাবাটা এবং দুধ দিয়ে দিন। প্রয়োজন হলে একটু জল দিতে পারেন। আমি অনেক সময়ই শুধু দুধের বেসেই রান্না করি। তারপরে পরিমাণ মত নুন আর চিনি। একটু মিষ্টি মিষ্টি হলে ভাল লাগে রান্নাটা। সেই আন্দাজ মত চিনি দেবেন। নামাবার একদম আগে উচ্ছেভাজাগুলো দিয়ে দিন (বেশি আগে দিলে ঝোলটা তেতো হয়ে যায়) আর তার আরেকটু আগে বড়িগুলো। বড়িগুলো যেন ভেজার যথেষ্ট সময় পায়, এই রান্নায় কুড়কুড়ে বড়ি মোটেই ভাল লাগেনা। রান্না হয়ে গেলে একটু ঠাণ্ডা হতে দিন, তারপর পরিবেশন করুন। এই রান্নাটা একদিন ফ্রিজে রেখে দেবার পর যেন আরও সুস্বাদু হয়। তবে টাটকা খাবারও আলাদা মজা।

কেবল এই লাউ শুক্তো দিয়েই গোটা ভাতটা খাওয়া হয়ে যায় আমার। আপনার কেমন লাগে দেখাই যাক!

২.

পরবর্তী খাবার হল এক রকম আইসক্রিম। বলা যেতে পারে শসা-পানের আইসক্রিম। যদিও এর মধ্যে আমি আদৌ দুধ বা ক্রিম যোগ করি না। তাই টেকনিকালি একে আইসক্রিম বলা যায় কিনা সন্দেহ। যাক গে, এটা বানাতে লাগবে বেশ কিছুটা শসা, গোটা দুয়েক মিষ্টি পানের পাতা, পরিমাণ মত চিনি, আর অল্প নারকোলের দুধ বা কোকোনাট মিল্ক। বানানোর পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। শসার খোসা ছাড়িয়ে বেটে নিতে হবে। কচি শসা হলে ভাল, নাহলে বীজগুলো ঝামেলা করে। পানটাকে বেটে রসটা বার করে নিতে হবে, তারপর মিশিয়ে দিতে হবে শসাবাটার সঙ্গে। পানের পাতার

কুচিগুলো কিন্তু দেবেন না, কেবল রসটাই যথেষ্ট। এবার একটা পাত্রে কোকোনাট মিল্কটা নিয়ে তার মধ্যে এই মিশ্রণ দিন, মিষ্টির জন্যে চিনি দিয়ে সমস্ত মিশ্রণটাকে একটু গরম করুন। জল জল ভাবটা শুকিয়ে গিয়ে মিশ্রণটা যখন থকথকে হয়ে আসবে তখন আঁচ বন্ধ করে ঢেলে রাখুন ছোট ছোট কাপের মধ্যে।

ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ফ্রীজারে ঢুকিয়ে রাখতে হবে যতক্ষণ না জিনিসটা জমে আসে। তবে একদম জমে পাথর হয়ে গেলেও খাওয়া যায় না, তাই একটু নরম থাকতে থাকতে পরিবেশন করাই শ্রেয়।

লাঞ্চের পরে আয়েস করে বসে উপভোগ করুন শসা-পানের আইসক্রিম।

আজি এসেছি...

সীমা ব্যানার্জি রায়

যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিল অর্থিত। বরাবরই পড়াশুনায় খুব ভাল ছেলে। আর মহুয়া ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী। উভয় পরিবারই বাঁশবেড়িয়ার মুখার্জ্জীপাড়ার বাসিন্দা। দুজনেরই বাবা একসঙ্গে রেলে কাজ করতেন। সেই সুবাদেই পারিবারিক হৃদ্যতা এবং আবাল্য সঙ্গীর অকপটে দু'বাড়িতে আসা যাওয়া। কৈশোরের নির্মল সখ্যতা যৌবনে নিশ্চিত প্রেমের হাতছানির সঞ্চার করেছিল দুটি মনে। কিন্তু কে জানত মনের অজান্তেও মন বদলে যায়, বদলায় সখ্যতার ধরণ। শহর ছেড়ে নয় একেবারে দেশ ছেড়ে আমেরিকা যেতে হয়েছিল অর্থিত-কে। এবার আসন্ন পূজোর আকর্ষণ তাকে বেঁধে রাখতে পারল না।

১.

এরই মধ্যে কচির মা তিনবার তাগাদা দিয়ে গেছে মহুয়াকে স্নান সেরে নেওয়ার জন্য। মহুয়াকে খেতে দিয়ে ও মহুয়ার ছেলে টুবাইকে স্কুল থেকে আনতে যাবে। কচির মায়ের চেঁচামেচিতে মহুয়া বৃষ্টিঝরা শরৎ-দুপুরে ফিরে আসে। কচির মা অনেকদিন এ বাড়িতে বহাল।

কাজের লোক হলেও মহুয়াকে শাসন করে, ভালোবাসে ঘরের লোকের মতোই। একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকুরিরতা মহুয়া ছুটিছাটা পায় কম। সংসারের সব কাজ কচির মা-ই করে। টুবাইকে স্কুলে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা সবই করে কচির মা। অফিস-বাড়ি করেই যেন মহুয়া ক্লান্তিরাজ্যের রানি সেজে গেছে।

কাজেই এই ছুটির দিনটা এলেই মহুয়া হাত-পা ছাড়া অবস্থায় নানারকম ম্যাগাজিন, টিভি-ভিডিও, এসব নিয়েই থাকে। কিন্তু আজ সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ম্যাগাজিনের পাতা ও আর উল্টাচ্ছিল না, নিজের অজান্তেই উলটে যাচ্ছিল নিজের অতীত অধ্যায়ের পাতাগুলো। চাকরি, বাসা,

টুবাই, কচির মা, অসীমা-অমিতদা, এদের ঘিরে জীবনটা বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ ধুমকেতুর মতো অর্থিতের আগমনটাই যেন শারদপ্রাতে কালবৈশাখীর ঝড় তুলল মহুয়ার মনে। ঘরে-অফিসে সবখানেই মনে মনে অর্থিত-কাহিনী দৌড়াচ্ছে অতীত থেকে মহাঅতীতে।

অর্থিত তখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ছুটিছাটায় বাড়িতে এলে মহুয়ার সাথেই হৈ চৈ করে কাটাত। মহুয়ার ডাকেই বসন্তবরণ দেখতে এসেছিল। তা না হলে মাকে সেবার বলে গিয়েছিল “প্রচণ্ড পড়ার চাপ, সামনে পরীক্ষা, দু তিন মাস বাড়িতে আসব না।” কিন্তু কে জানত অর্থিতকে বসন্ত উৎসবের বদলে মায়ের শ্মশান-উৎসবে যোগ দিতে হবে।

সাদা গরদে ঢাকা মায়ের মৃতদেহটা ছুঁয়ে অনেকক্ষণ বসেছিল অর্থিত। হঠাৎ সেখান থেকে উঠে গিয়েছিল সে। মহুয়া বুঝেছিল অর্থিত ছাদে গেছে। তারার ফোড় তোলা জরির ঠাসবুনন নীলাম্বরী আকাশ আঁচলের মতো ছড়ানো, তার তলায় একলা হয়ে দাঁড়িয়ে অর্থিত। মহুয়া গিয়ে দাঁড়াতেই তার দিকে তাকাল সে। হাত বাড়িয়ে দিল - আয়। কেমন থমথমে হা হা শূন্যতা গলার স্বরে। শোক কি মানুষকে খুব গভীর, খুব পৃথক করে দেয় ?

পিঠঢাকা একরাশ এলোচুলে মুখ ডুবিয়ে ছেলে মানুষের মতো কেঁদেছিল অর্থিত। এমন মজার প্রাণোচ্ছল ছেলেটা এমন করে কাঁদতে পারে? নাকি তার ছোঁয়া পেয়েই ওর সমস্ত মেঘ এমনি করে বর্ষাচ্ছে?

অর্থিতকে সান্ত্বনা দেবার এতটুকু চেষ্টা না করে মহুয়াও তখন হু হু করে কেঁদে ফেলল। টিনামাসিমা মহুয়াকে খুব স্নেহ করতেন। তবু এই কান্না ঠিক তাঁর জন্য নয়। পরে মায়ের শোক কিছুটা শান্ত হবার পর মহুয়া অর্থিতকে বলেছিল - “অমন ছোট ছেলের মত কাঁদলি!”

অর্থিত জবাব দিয়েছিল - “মানুষের তো অন্তত একটা জায়গা চাই কাঁদবার জন্য।”

তবু কেন মহুয়া বোঝেনি তখনও! মহুয়া কি এতটাই অবোধ বা ছেলেমানুষ ছিল?

২.

বড় হওয়ার জন্য বিয়েটা কি এতই জরুরি?

তা না হলে কথায় কথায় সুমন মানুষের স্বরূপ নিয়ে এত উদাহরণ দিত কেন? বউভাতের দিন গভীর রাতেই বা সুমন নববধূকে কেন বলবে - "মানুষের স্বরূপ কি বল তো?" কিংবা বিয়ের ঠিক ষোল দিনের মাথায় সুমন যখন ওকে চড় মারল তখনও সে ঘটনার সূত্রপাত কিছুই বোঝেনি কেন?

বরং দুঃখ পেলেও তার চাইতে বেশি পেয়েছিল লজ্জা। মনে মনে আশা করেছিল - ইস কাল সকালে বেচারা খুব লজ্জা পাবে। কাঁচুমাঁচু হয়ে আমার কাছে মাফ চাইবে। অকারণে গায়ে ঘেঁষতে চাইবে। অবেলায় আদর করবে। এমনি কত কি ভেবেছিল মহুয়া। অথচ পরেরদিন সকালটা ছিল ঠিক বিপরীত।

সুমন বাঁশবেড়িয়ার নিজেদের বাবার গার্মেন্ট ব্যবসার একছত্র পারমিটধারী মালিক। সকালে ভাত খেয়ে দোকানে যাবার সময় রুটিনমাফিক পান চিবোতে চিবোতে বলেছিল - "অত মুখ ভার করে লাভ নেই। আমি খুব সোজাসাপটা মানুষ। আমার কাছে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর, বুঝলে?"

কথা তো নয় যেন ভারি পাথরের টুকরো। ছুঁড়ে দেওয়ার পর ভীষণ জোরে ঘা দিয়ে যায়। তাও শরীরে নয়, এতদিনের জমানো তার বিবাহিত জীবনের আবেগ, কিশোরীবেলা থেকে বুনে রাখা নীলাম্বরী স্বপ্নে-আকাঙ্ক্ষায়।

মহুয়া তার নিজের অদৃষ্টকেই দায়ী করে, কাউকে দোষ দেয় না। এক শীতের রাতে চারমাসের নরম তুলতুলে টুবাইকে বুকে চেপে যখন ঘেন্নায়, কষ্টে, প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিল দাদাদের কাছে, রাতটুকুর বেশি আশ্রয় জোটেনি। গভীর রাত পর্যন্ত তর্কাতর্কি চলেছিল।

- যে পুরুষ মদ খায় না, অন্য নারীর দিকে নজর দেয় না, জুয়া তাসের আড্ডায় যায় না। সেই পুরুষকে খারাপ বললেই হল ?

কাকে বোঝাবে মহুয়া, এসবের চাইতেও ইতর ছিল সুমনের স্বভাব।

পান থেকে চুন খসলেই নোংরা গালাগালি করত, কথায় কথায় দোষ বের করে বেধড়ক মারধর করত, যখন তখন অশালীন ইঙ্গিত করে সন্দেহ করত। এসব দাদা এবং জামাইবাবুদের চোখে দোষের নয়। মানিয়ে নেওয়ার কথাই সবাই জোর করে বলেছিল।

বৌদিরা বলেছিল - "এমন করলে মান-সম্মান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভেবেছ? বাড়িতে আরও যে মেয়েরা আছে তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে, তা চিন্তা করেছ?"

সবার কথা চিন্তা করেই খুব ভোরে কাউকে না জানিয়ে টুবাইকে নিয়ে চলে এসেছিল মহুয়া।

বাঁশবেড়িয়ার রেলস্টশনে বসেছিল অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝেই ভাবনায় আসা-যাওয়া করছিল -

রেলের চাকা, দড়ি-কলসি, রূপনারায়ণের ঢেউ, ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি। সে ভাবনাকে স্থায়ী হতে দিচ্ছিল না টুবাইয়ের খিদের কান্না। ডোঙ্গোরগড়ের ট্রেন ধরে চলে এসেছিল প্রাণের বান্ধবী অসীমার কাছে।

অমিত-দা আর অসীমার সাথে মহুয়ার যোগাযোগ ছিল সবসময়ই। গায়ের সমস্ত গয়না বিক্রি করেই চলে এসেছিল অসীমার বাড়িতে। অসীমা শুধু ওর সহপাঠিনীই ছিল না - ছিল ঠিক বোনের মতো। অসীমার স্বামী অমিতদার যোগাযোগের কারণেই চাকরিটা হয়ে গেল। স্বামী পরিত্যক্তা,

সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী, এই সব মানবিক বিবেচনা করেই এত প্রতিযোগিতার বাজারেও মহুয়ার চাকরিটা হয়ে যায়।

৩.

সুদূর উইসকন্সিন-এ বসে অভিমান আর আত্মহননের জেদ নিয়ে জীবন কাটাচ্ছিল অর্থিত। নামকরা পেপার মিলসের স্পেসালাইজড পোস্টে থাকা সত্ত্বেও ফেলে আসা অতীত তাকে ছিঁড়েকুঁড়ে খায় দিনরাত, সময় পেলেই। মহুয়াকে তো মনের সাজানো সংসারের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। কি এক অবুঝ ছেলেমানুষ ছিল সে!

প্রবাস-জীবনে খুশিতে থাকার মতো অনুকূল পরিবেশের অভাব ছিল না অর্থিতের। কিন্তু মহুয়াকে ভুলে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থিত বুঝেছে এ জীবনে তা আর সম্ভব নয়।

কিন্তু একদিন সে সত্যি স্নায়ুযুদ্ধে জয়ী হল। দেশে সে যাবেই ঠিক অক্টোবরে দুর্গাপুজোর সময়। কত বছর দেশের পুজো দেখেনি সে। অথচ মহুয়াকে নিয়ে স্মৃতিবিজড়িত বাঁশবেড়িয়ার পুজোর কথা লিখলে ছোটখাটো একটা উপন্যাস হয়ে যাবে।

আজ যদি মহুয়া তাকে দেখে খুশি নাও হয়, তবু মহুয়া নিজের সংসারসুখে পরিপূর্ণ হয়ে আছে - সেটুকু দেখেই খুশি হয়ে ফিরে আসবে সে আবার তার যায়গায় উইস্কন্সিন-এ।

দেশে এসে অর্থিতের মতো বিদেশে প্রতিষ্ঠিত ছেলে সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, সুশীলা কোনও পাত্রীর খোঁজ করার বদলে মহুয়ার মতো ঘরছাড়া মেয়ের খোঁজ করছে বলেই...... সে আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে কোন সমর্থন পেল না। সামাজিক বিবেচনায় মহুয়া যে দাগধরা ফল, দেবতার নৈবেদ্যে তার স্থান নেই।

শেষ পর্যন্ত দিঘার অজস্র মানুষের জোয়ারেও অসীমার মাধ্যমে সে মহুয়াকে খুঁজে পেল। মহুয়ার মুখেই শুনল মহুয়ার মহুল ফুলের রূপকথা। কি হবে দুঃখ করে। টুবাইয়ের কথা ভেবেই মহুয়া বলল

- আমি আর সুমনের কাছে ফিরে যেতে চাই না, অর্থিত। জীবনের সবচেয়ে আদরের দুলালীটিকে যেমন জীবন থেকে ছিঁড়ে ফেলা সম্ভব নয় তেমনি কি করে সহ্য করবে যখন সেই আপনজন অন্য কারও জীবনে কাঁটা হয়ে ওঠে।

- মৌ আজ থেকে তুমি আমার মৌচাকের মৌ হয়ে থাকবে। তুমি কি অস্বীকার করছ সেই অন্যজনটি এখনও তোমার প্রিয় নয়, বড় আকাঙ্ক্ষিত নয়? আমি তো দেশে এসেছি মায়ের ডাকে, মা দুর্গতিনাশিনীই আজ আমাকে তোমাদের মাঝে এক করেছেন

পরমজিতের পা

ডঃ শ্রীমতি অন্নপূর্ণা বসু

আমার বাবা এবং কাকা দুজনেই ডাক্তার। উভয়েই ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫-এর মধ্যে। পাশ করার পর বাবা প্রথমে বিহার গভর্নমেন্টে যোগ দেন, পরে রেলওয়েতে। আর কাকা যোগ দেন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজেরই চিকিৎসা-শিক্ষক ও ডাক্তার হয়ে।

বাবার পোস্টিং তখন রাজস্থানে। আমার ঠাকুর্দা-ঠাকুমাও তখন থাকতেন আমদের সাথে। আমি খুব ছোট ছিলাম। আর ছোটরা যেমন হয়, গল্প শুনতে আমিও খুব ভালবাসতাম, বিশেষ করে ভূতের গল্প। একদিন ঠাকুর্দাকে ধরলাম। বললাম - গল্প শুনবই আজ, তাও ভূতের গল্প।

ঠাকুর্দা হাসতে লাগলেন, বললেন - ভূতের গল্প শুনবি দিদিমণি? তো তোর বাবার কাছে যা... আসল ভূতের গল্প বলবে ও।

- আসল ভূতের মানে ?

- তোর বাবা ভূত দেখেছে... সেই ঘটনাই শোনাবে...

- বাবা ভূত দেখেছে...?

- হ্যাঁ একেবারে সত্যি ঘটনা... এমন ঘটনা যাতে শুধু তোর বাবাই নয়, তোর বড়কাকা, ওদের বন্ধুরা... ও আরো অনেকেই দেখেছে...

- কি বলছ ?

- যা না... গিয়ে জিজ্ঞেস কর্।

বাবা ছিলেন ব্যস্ত মানুষ। তায় বেশ একটু গম্ভীর মেজাজের। তাঁর কাছ থেকে গল্প আদায় করা সোজা ছিল না। একদিন অবস্থা বুঝে আদায় করলাম।

বাবা বললেন - এটা কে বলল তোকে ?

আমি বললাম - ঠাকুর্দা....

বাবা বললেন – ভয় পাবি না তো ?

আমি বললাম - না বাবা একেবারে না...

বাবা বললেন - তবে শোন্

সেই যে বাবার কাছে গল্প শুনতে শুরু করলাম, এক অন্তহীন গল্প বলা আর শোনার পালা চলল তারপর থেকে। বোধহয় বাবারও গল্প বলার নেশা হয়ে গিয়েছিল শেষের দিকে। কিন্তু সে কথা এখন থাক। ভূতের গল্পটা শোনাই...

বাবা বললেন -

"আমি তখন ফাইনাল ইয়ারে পড়ি ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে, তোর বড়কাকা সবে ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছে আমাদের জুনিয়র হয়ে। হোস্টেলে একই রুমে থাকতাম তিনজন। আমি, তোর কাকা আর আমারই এক ব্যাচমেট। সেবার আমার একটা সেমিনার ছিল নী-জয়েন্ট, মানে হাঁটুর ওপর। ভীষণ ব্যস্ত থাকতাম তখন। আবার ফার্স্ট ইয়ারের বই খুলে এনাটমি পড়ার ইচ্ছা বা সময় কোনটাই ছিল না।

তোর কাকাকে বললাম - এনাটমির থেকে দুটো পরিষ্কার দেখে হাড় এনে সন্ধ্যাতে আমাকে নী-জয়েন্টটা রিভাইজ করিয়ে দিবি।

সন্ধ্যাতে তোর কাকা আমাকে বলল - দাদা, পড়বি নাকি? আমি পড়ে নিয়েছি...

আমার জানিনা কেন ইচ্ছা হল না, বললাম - অনেক রাত হল, আজ থাক, কাল শুনব... হাড় এনেছিস ?

- হ্যাঁ রে দাদা, দ্যাখ্ কেমন সুন্দর ফটফটে পরিষ্কার হাড় এনেছি, এখনও এটা কেউ ইউজ করেনি... দামু ডোমকে ধরে আদায় করেছি, চা খাওয়াতে হল...

- হুঁ... রাখ্ এখন, কাল বলিস, আজ থাক...

- শোন্ই না, ভাল করে পড়েছি রে দাদা...

- আঃ... বললাম তো, মাথাটা ধরেছে... শুনবার ধৈর্য্য নেই...

তোর কাকা বোধহয় মনঃক্ষুণ্ণ হল, কারণ ও কিছু আর না বলে রুম থেকে চলে গেল।

রুটিনমাফিক খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়েছিলাম, হাড়টা আমার মাথার কাছেই রাখা ছিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানিনা, হঠাৎ মনে হল কেউ জড়ানো কর্কশ গলায় ডাকছে। আমি ঘুমোচ্ছিলাম না জেগে গিয়েছিলাম, ঠিক বলতে পারব না, তবে শুনলাম কেউ বলছে, 'মেরা টাংগ লৌটা দে জলদি, কিতনা তকলিফ মে হুঁ তুঝে কেয়া মালুম? সুনা নহী ক্যা?'

ভাবলাম বাইরে কোন রুগী হবে, কারও জন্য বলতে এসেছে। তার পর কেউ আমাকে নড়ালো। ভাবলাম হয়তো তোর কাকা ডাকছে, খুব বিরক্তি হল, জবাব দিলাম না। আবার শুনলাম কেউ বলছে, 'ক্যায়সে সমঝেগা ? চল্ জব তেরাই টাংগ লে জাউঁঙ্গা তব তেরেকো সমঝ মে আয়েগা!!' পর মুহূর্তে মনে হল কেউ যেন বরফ ঠান্ডা হাত দিয়ে আমার একটা পা ধরে টানছে। ধড়মড় করে

উঠে বসলাম, রাত তখন অনেক, সবাই অঘোরে ঘুমাচ্ছে, আর কেউ কোথাও নেই, কেউ কথাও বলছে না। অবাক হয়ে গেলাম। দুঃস্বপ্ন দেখেছি ভেবে আবার শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করলাম।

পাঁচ মিনিটও গেল না, আবার শুনলাম কেউ বলছে, - 'বাঃ বেটা ফির সো গিয়া, অব তো তু মেরা টাংগ লৌটায়েগা, নহী তো জিন্দগী ভর কে লিয়ে সোয়েগা...' এবারে আমার গলাটা ধরল সে। আবার ধড়মড় করে উঠে বসলাম। গলাটাতে হাত বুলাতে উঠে ভাবতে লাগলাম যে হচ্ছেটা কি ? এমন তো কখনও হয়নি!! হাড়টা আমার মাথার কাছেই রাখাছিল হঠাৎই সেটার ওপর নজর পড়তেই চমকে উঠলাম......। বুকের মধ্যেটা যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। এটার জন্যেই তো নয় ? তোর কাকা বলেছিলো দামু ডোম কে ধরে নতুন ঝকঝকে হাড় এনেছে......

আমি উঠে হাড়টা তোর কাকার মাথার কাছে রেখে আবার শুয়ে পড়লাম চুপচাপ....দেখা যাক্ কি হয়....

দশ মিনিট গেল না, তোর কাকা ধড়মড় করে উঠে বসল, দু মিনিট ঝিম মেরে বসে থেকে আমাকে ধাক্কা দিল - দাদারে.... ও দাদা....

কি হল? - উঠে বসলাম, ভাবলাম; নাঃ, কিছু না কিছু তো হচ্ছেই, স্বপ্ন নয়।

তোর কাকা তখন বলছে "ও দাদা আমার গলাটা ধরল কে রে ? দাদারে... পরমজিতের পা..."

"কি হল?" - আমি বললাম, "স্বপ্ন দেখলি না কি ? পরমজিতের পা আবার কি?"

তোর কাকা তখন বলল - স্বপ্ন ? জানিনা... দেখলাম একটা ইয়ং সর্দার বলছে 'ম্যায় পরমজিৎ... তু মেরা টাং লে কে ভাগা...উসকো তাকিয়া বানাকে সোতা...? ঔর ম্যায় লংগড়া রহা... ওয়াপস্ কর আভী নহী তো মার ডালুঙ্গা তেরেকো...' বলে আমার আমার গলাটা ধরল...

তোর কাকা তখনো হাঁপাচ্ছিল।

ওকে শান্ত করে আমরা হাড়গুলো উঠিয়ে বাইরের ঘুমন্ত দারোয়ান রামহরির মাথার পাশে রেখে সরে এলাম। তাপর এক ঘটল অবিশ্বাস্য ঘটনা, দারোয়ান রামহরিকে বিরাট চিৎকার করতে শুনলাম। দৌড়ে গেলাম আমরা, দেখলাম এক অদৃশ্য হাত দারোয়ান রামহরিকে একটা পা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর দারোয়ান রামহরি তারস্বরে চিৎকার করছে। আমরাও হাঁউ মাঁউ করে চিৎকার করতেই সব থেমে গেল। আর দারোয়ানও বেহুঁস হয়ে গেল। আমরা ওকে জল দিয়ে সুস্থ করে আবার রুমে গিয়ে বসলাম...ততক্ষণে চোখ থেকে ঘুম উড়ে গিয়েছে।

- দাদারে...চারটা বাজল...
- হুঁ... চল্ গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসি, আর পরমজিতের পা-টাও ফেরত দিয়ে আসি।'
- কাকে? কি করে?
- পরমজিত গঙ্গার জলেই তো ভেসে এসেছে? তাই গঙ্গার জলেই দিয়ে আসব।

তারপর পরমজিতের পা গঙ্গার জলে দিয়ে ফিরলাম দু-ভাইয়ে ।

দারোয়ান রামহরি সপ্তাহ খানেক খুব অসুস্থ থাকার পর সুস্থ হল। তারপর কাজ ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। আর কখনো ফেরেনি। ভূতের উপদ্রবও আর কখনো শুনিনি।

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে গল্পের মত সত্য ঘটনাটা শুনলাম। একবারও বলিনি যে ভয় পেয়েছি। নাহলে আরও গল্প শোনার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে তো !

সফট ফোকাস

উদীচ্য

ধুয়ে মুছে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো। পাটকাঠি আগুনে অতীতের স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক। ধিকিধিকি জ্বলছে, নিভছে, ফের জ্বলছে। সিনেমার নেগেটিভের মত চঞ্চল। একাকী দৃশ্যমান নয়, তার বিস্তার সমষ্টিতে। এরা হোমো স্যাপিয়েন্স। পড়ে পাওয়া কিছু মুহূর্ত আঁকড়ে বেঁচে থাকে। রাজবেশ পরিয়ে দেয় নিজের হাতে। উষ্ণীষ রাখে মস্তকে। মাণিক্যমোড়া হীরকদণ্ড ধরিয়ে দেয় কাঁপা কাঁপা হাতে। তারপর খেয়ালে বেখেয়ালে বাজারে কুচো মাছ কিনতে গিয়ে, স্বেদবিন্দু মুছে নিতে নিতে রোজকার বরাদ্দ বাসের সিঁড়ির ধাপে, খিচুড়ির সাথে ইলিশের অতীতচারণে অজ্ঞাতে ভুলে যায় সময়ের রাশ ধরতে। পায়ের নিচের বিন্দু বিন্দু মাটি ব্রাউনিয়ান মোশনে নাড়াচাড়া করে। বীজ বাড়তে বাড়তে বনস্পতি। কিন্তু তার যে হুঁশ নেই। নিজেকে কেউকেটা বা কানকাটা ভাবছে তখন। ভাবছে স্টেরয়েড মেরেছি, ব্যথা কমবে। পিৎজা সেঁটেছি, র‍্যালা বাড়বে। চারা পুঁতেছি, হাইব্রিড হবে। এদিকে শিরায় শিরায় নিকোটিনের ক্যাকোফনি। ফাঁকা বুলেটে অজান্তে বারুদ ভরা হয়। শুটিং শুটিং খেলা শুরু হয়। আলো জ্বলে। রেকর্ডিং যন্ত্র চালু হয়। স্টার্ট, সাউন্ড, ক্যামেরা, অ্যাকশন। ডামি ছিল কিন্তু হয়ে গেল অনেকগুলো ব্রেনডন লি। লাশ পড়ে। মাথা ফাটে। দু চোখে সৌরমণ্ডল। ভ্রাম্যমান শব্দ। তুষারকুচির মত হ্যান্ডবিল ঝরে আকাশপাখি থেকে। শিশু স্কুলে নিয়ে যায়, চাষাভুসো কুড়িয়ে মোচ্ছব করে, এন্তার দেশি টানে, বৌ পেটায়, শেষে উনুনে দেয়। কিছু নৌকো হয়ে পাশের পাড়ার ড্রেনে নোয়ার নৌকো হয়ে ঘোরে। আশ্রয়ে থাকে পিঁপড়েরা, প্রায় মৃত তেলাপোকা, একগোছা মানুষ-কেনা ম্যাজিকাল শব্দ। গিলি গিলি গিলি গে হোগাস পোকাস... সেধে নিবি নে আনকোরা বাঁশ। আব্রা কা ডাবরা, খিচুড়ি আর লাবড়া। এটসেটরা গুনতে গুনতে ব্যাকরণ ফেল। কত অঙ্ক, কত প্রশ্ন, কত ছলছুতো। কেউ ঘরছাড়া, দাদা পাড়াতুতো। জলে বিষ, আর্সেনিক, লেড। আছে হলিউড, ম্যাট্রিক্স রিলোডেড। ডিডাক্সনে শার্লক শেড। আস্তরণ, আবার আস্তরণ... তারপর সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক। তারপর আবার মুখোশ। ঝুলচে দেক ট্রাপিজের তারে দোদুলদোলায়। কোমরে কার একটা ধারালো দাঁত, মাথায় বেয়োনেট; চোখে এইট এন্ড আ হাফ। বিনি টিকিটের সার্কেস। ওই

তো আলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখছে দশরথ, মকবুল চাচা, মায়ের কোলে পুঁচকে তিন্নি... ভারত গ্রামের সব্বাই...।

অবকাশ মাছের বিরিয়ানি

অনির্বাণ শ্যাম

এই রান্নাটি একটু সময়সাপেক্ষ, অবকাশ ছাড়া করা যাবে না, সেই ভেবেই নামকরণ।

এর আগে অনেকবার বিভিন্ন পাকপ্রণালী দিয়েছি, যেগুলো আমার খেতে এবং বানিয়ে বন্ধুস্থানীয়দের খাওয়াতে বিশেষ ভাল লেগেছে। শুধু স্বাদ ছাড়াও, একটি পদের ঐতিহ্য, উপকরণ বা পাকপ্রণালীর বিচিত্রতা, পরিবেশনের কায়দা, রূপ ও গন্ধ এই সমস্তই আমাকে প্রভাবিত করে। এবারে অনেক ভেবেচিন্তে নতুন বোতলে পুরনো মদ পরিবেশন করাই ঠিক করলাম। খুব সাধারণ একটা পদ একটু অন্যভাবে রেঁধে, নিজে খেয়ে এবং জনাকয়েক ভোজনরসিককে খাইয়ে, তাদের মতামত নিয়ে বন্ধুদের জন্যও পাঠিয়ে দিলাম।

এই বিরিয়ানি বিশেষত্ব হলো যথাসাধ্য কম তেল মশলা দিয়ে রাঁধা, সহজপাচ্য অথচ মুখরোচক। আরেকটা সুবিধে হল এই একই রান্না বিভিন্ন মাছ দিয়ে করলে বিভিন্ন স্বাদ পাওয়া যাবে। আমি যেগুলো ব্যবহার করেছি এখনও পর্যন্ত, তার মধ্যে আছে আমার প্রিয় ভেটকি, পাকা রুই, কিংফিস, গলদা চিংড়ি, ব্ল্যাক পমফ্রেট। মসলার তালিকাটা একটু লম্বা হলেও করা সহজ, স্বাদটাও বেশ জম্পেশ হওয়া চাই তো নাকি!

মনে রাখার সুবিধের জন্য পুরো রান্নাটিকে চার ভাগে ভাগ করেছি। পরিমাণ মোটামুটি চার জনের জন্য। সময় লাগে ঘন্টা দেড়েক, মাছের মেরিনেশন আগেই করে রাখলে অনেক সময় বাঁচবে, সেই সময়ে ভাত আর অন্যান্য মসলা তৈরি করে নেওয়া যায়।

১. ভাত তৈরি

২. মাছ তৈরি

৩. ভাতে মাছ মিশিয়ে বিরিয়ানি প্রস্তত এবং

৪. পরিবেশন

১. ভাত তৈরি করতে উপকরণ লাগবে

বাসমতি চাল - ৫০০ গ্রাম

অলিভ বা যেকোনো সাদা তেল - ১ বড় চামচ

ছোট এলাচ - ২-৩ টি

লবঙ্গ - ২-৩ টি

দারুচিনি - ২ টুকরো ছোট

কালো মরিচ দানা - ৪-৫ টি

শাহী জিরা - ১/২ চা চামচ

তেজপাতা - ২ টি

নুন - ১ বড় চামচ

ডেকচিতে ফুটন্ত জলে বাসমতি চাল আর বাকি সব উপকরণ ঢেলে দিন, চালের অন্তত চারগুণ জল দরকার। ভালো ব্রান্ডের প্যাকড্ চাল যা আর আলাদা করে ধুয়ে না নিলেও চলে, এতে ভাত খুব গোটা গোটা থাকে। ৮-১০ মিনিট মত ফুটিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিন আরও মিনিট দশেক। এরপর একটা ঝাঁঝরি বা বড় চালনিতে ভাত ঢেলে দিয়ে ঠান্ডা জলের কলের নিচে রাখুন বা অনেক ঠান্ডা জল ঢেলে দিন। এতে ভাত ভাঙবে না, দলা পাকাবে না, সুন্দর গন্ধ থাকবে এবং তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে যাবে। এবারে গোটা মসলাগুলো যতটা পারেন বেছে ফেলে দিন, দেওয়ার সময় একটা কাপড়ে পুঁটলি পাকিয়ে দিলে এই স্টেপটা খুব সহজে হবে।

ভাতে বিভিন্ন রং আনতে চাইলে জাফরান দুধে গুলে তাতে কিছু রান্না করা ভাত মিশিয়ে মিনিট কয়েক রেখে তারপর বাকি ভাতে মিশিয়ে দিলে সুন্দর কমলা রং আসবে। একই ভাবে গরম জলে হলুদ দিয়ে হলদে রং, বিট দিয়ে বেগুনি রং করে দেখেছি, গ্রীণ-টি দিয়ে সবুজ রং ও দিব্যি হয়. আমি খাবারে যেকোনও সিন্থেটিক রং ব্যবহারের বিরুদ্ধে।

২. মাছ তৈরী করতে উপকরণ লাগবে - এতে আবার দুটি পর্যায় আছে, ভালমন্দ রান্নাবান্না কি উপন্যাসের থেকে কম নাকি !

২.১. প্রথমে মেরিনেশন করতে হবে, নিচের সব উপকরণগুলো মিশিয়ে ঘন্টা খানেক ফ্রিজে রেখে দিন।

মাছের ফিলে - ১ কিলো, বেশি দিলেও ক্ষতি নেই, মোটামুটি ১.৫ ইঞ্চি চৌকো করে কাটা

মেথি পাউডার - ১ চা চামচ

সাদা মরিচ পাউডার - ১ চা চামচ

লাল লঙ্কার পাউডার - ১ চা চামচ

জিরে পাউডার - ১ চা চামচ

পুদিনা ও ধনেপাতা বাটা - ১ বড় চামচ

কাঁচা লঙ্কা, রসুন ও আদা বাটা - ১ বড় চামচ

লেবুর রস - ১ বড় চামচ

টক দই - ১ বড় চামচ

হলুদ পাউডার - ১/২ চা চামচ

অলিভ বা যেকোনো সাদা তেল - ১ বড় চামচ

নুন - ১/৩ বড় চামচ বা পরিমাণমত

২.২. এবারে মাছ রান্না, উপকরণ লাগবে;

পেয়াজ বাটা - ২ বড় চামচ

লাল কাশ্মীরি লঙ্কা বাটা - ১/২ বড় চামচ (ঝাল স্বাদ ও রুচি বুঝে বাড়াতে পারেন)

গরম মশলা বাটা - ১ চা চামচ

হলুদ পাউডার - ১/২ চা চামচ

টমেটো পেস্ট - ১ বড় চামচ

হিং - ১/৪ চা চামচ

পোস্ত আর নারকেলের পেস্ট - ১ বড় চামচ

গাওয়া ঘি বা মাখন - ১ বড় চামচ

অলিভ বা যেকোনো সাদা তেল - ১ বড় চামচ

নুন - ১/৩ বড় চামচ বা পরিমাণমত

কালো জিরে - ১/৩ চা চামচ

শুকনো লঙ্কা - ২-৩ টি

নন স্টিক ফ্রাই প্যানে অলিভ বা যেকোনো সাদা তেল গরম করে মেরিনেট করা মাছগুলো হালকা ভেজে নিন।

এবারে কড়াইতে ঘি বা মাখন গরম করে কালো জিরে, হিং আর শুকনো লঙ্কার ফোড়ন দিন, এবারে পেয়াজ বাটা দিয়ে কম আঁচে লালচে করে ভাজুন, এরপর বাকি সব মসলা দিয়ে আরও ২-৩ মিনিট নাড়ুন থকথকে হওয়া পর্যন্ত, একটু যেন জল থাকে, না থাকলে খুব সামান্য গরম জল দিন। এবারে হালকা ভাজা মাছ দিয়ে সাবধানে নেড়েচেড়ে ঢাকা দিয়ে মিনিট দশেক ভাপে সিদ্ধ হতে দিন, এতে মসলাও শুকিয়ে মাছের টুকরোর গায়ে লেগে যাবে। হয়ে গেলে নামিয়ে রাখুন।

৩. ভাতে মাছে মিশিয়ে বিরিয়ানি প্রস্তুতি

এই পর্যায়ে উপরোক্ত ভাত ও মাছ ছাড়াও আরেকটা গার্নিশিং বানাতে হবে, তাতে লাগবে;

পেয়াজ রিং করে কাটা - ২৫০ গ্রাম

কাজু, কিসমিস, আমন্ড টুকরো - ৫০ গ্রাম, বেশি হলেও ক্ষতি নেই

আনারসের ছোট টুকরো - ২৫০ গ্রাম

অলিভ বা যেকোনো সাদা তেল - ১ বড় চামচ

তেজপাতা - ৭-৮ টি

ধনেপাতা বা পার্সলে পাতা কুচোনো - ৫০ গ্রাম মত

কড়াইতে তেল গরম করে আগে পেঁয়াজ ভাল করে ভেজে নিয়ে শেষে শুকনো ফল আর আনারস ও সামান্য ভেজে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন।

এইবারে যে যেমন ভাবে ভাপাবেন বা দম দেবেন একটা ডেকচিতে বা মাইক্রোওয়েভ/বেকিং বোল এ নিচে প্রথমে কয়েকটি তেজপাতা বিছিয়ে দিয়ে, কিছুটা বিরিয়ানির ভাত, একটু রং করা ভাত, কয়েক টুকরো মাছ আর পেঁয়াজের গার্নিশিং ছড়িয়ে দিন, এর ওপরে কয়েক ফোঁটা গোলাপজল ছিটিয়ে দিন। এইভাবে কয়েকটা স্তরে বিরিয়ানি সাজিয়ে নিন। উপরে ধনেপাতা বা পার্সলে পাতা কুচোনো দিন। এবারে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে ঢেকে দমে বসান। ২০০ ডিগ্রিতে ওভেন প্রি-হিট করে তারপর ঢোকান এবং দশ মিনিট রেখে পাঁচ মিনিট ঠান্ডা হতে দিয়ে বার করুন।

৪. পরিবেশন:

ভাত ও মশলা স্তরে স্তরে থাকে বলে পরিবেশন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চ্যাপ্টা স্প্যাচুলা দিয়ে খাড়াভাবে স্তরগুলি কাটা হয়, তা না হলে ঠিক মিক্স হবে না. এর সঙ্গে একটু গ্রিন স্যালাড, কাসুন্দি, রায়তা আর আমের চাটনি হলেই যথেষ্ট।

খেয়েদেয়ে কেমন লাগল জানাতে ভুলবেন না কিন্তু !

রামদাস তপস্বী

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পর রামদাস বাবাজী, যোগনিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন!

যোগের প্রভাবে তাঁহার অঙ্গ গৌরকান্তি, অনিন্দ্যসুন্দর! দেখিলে, ত্রিংশ বৎসরীয় যুবার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

মৃত্তিকা গহ্বরে প্রোথিত পেটিকা হইতে দেহকে নিষ্ক্রামিত করিয়া শির উপরে নেওয়ার জন্য চেষ্টিত হইলে, কঠিন প্রস্তর সদৃশ কিছুতে মস্তক বাধাপ্রাপ্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ চেষ্টা করিলেও যখন হইল না, তখন রামদাস, যোগবলে মৃত্তিকার ওপরে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করিলেন।

রাত্রি ধরিত্রীর ওপর নামিয়া আসিয়াছে। রাকার ক্ষপা হইলেও চন্দ্রমার দর্শন না পাওয়াতে রামদাস বিব্রত হইলেন! চতুর্দিক আলোকজ্জ্বল, কিন্তু ইহার উৎস কি, তাহা রামদাসের বোধগম্য হইল না!!

রাজপ্রাসাদের ন্যায় চারিপার্শ্বে সুরম্য বাটীসকল দর্শনে সুখ বোধ হইতেছে! অকস্মাৎ একটি অশ্ববিহীন শকট সশব্দে রামদাসের নিকট দণ্ডায়মান হইলে, শকটের বাতায়ন হইতে এক ব্যক্তি, জিহ্বা ঈষৎ জড়িত অবস্থায় বিজাতীয় বঙ্গভাষায় রামদাসের প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিল। রামদাস প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না।

“এই শালা! ধিনিকেষ্টর মত মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি করছিস বে! একটু হলেই শ্লা কেস খেতাম! শ্লা, খালি গায়ে আবার লাল কাপড় পরেছে! ফিল্ম শুটিং নাকি বে!”

রামদাস এইরূপ মিশ্রিত যাবনিক বঙ্গভাষা শ্রবণ করিয়া, হতবুদ্ধি হইলেও মুহূর্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিলেন – মহাশয়! এই স্থানটিতে আমি নবাগত নই, তথাপি এইসকল পরিবর্তন দেখিয়া আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়! আমি বর্তমানে কোথায়?

- শ্লা!! রাত দুটোর সময় হাতিবাগানে লাটক করছে! অ্যাই কি ভাষায় কথা বলছিস বে?

- এই স্থান, হাতিবাগান?

- আবে! সর তো! যেতে দে! পুলিস দেখলে কেস খাবো! সর বে!

রামদাস পথি পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। পরে বুঝিলেন, ব্যক্তিগণের সকলেই সুরাপ্রভাবে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। সাতিশয় পিপাসার্ত বোধ করিতেছেন, রামদাস!! কিঞ্চিৎ ক্ষুধারও উদ্রেক হইতেছে।

"ইচ্ছায়া নিরঙ্কুশত্বাচ্চ"!! মনে পড়িল!

অর্থাৎ- ইচ্ছার নিয়ামক নাই। জল এবং খাদ্যের জন্য তিনি অত্যন্ত লালায়িত। তিনি বুঝিলেন, তাঁহাকে নিরন্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে।

যোগনিদ্রা কালে এইসকল ক্লেশ অনুপস্থিত ছিল। অকস্মাৎ এক দিব্যপুরুষ তাঁহার নিকট দেবতার ন্যায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন -

হে রামদাস ! আপনি সিদ্ধপুরুষ। কলিকাতা শহরের বর্তমান অবস্থায় আপনার প্রয়োজন হেতু আপনার যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছি। আপনার কতর্ব্যসমূহ আমি পরে নিবেদন করিব। এক্ষণে, আপনি এই তপোবনসুলভ ফল এবং সুশীতল পাদক গ্রহণ করুন। রামদাস ফল এবং সুশীতল জল গ্রহণ করিয়া, ক্ষুধানিবৃত্তি এবং পিপাসাশান্তি করিলেন।

ক্ষুধানিবৃত্তি ও পিপাসানিবৃত্তি হইলে পরে, সেই দেবোপম পুরুষ কহিলেন -

হে, যোগরাজ! আপনার, অতি অদ্ভূত মনোহর মূর্তি এবং প্রভূতমাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী দৃষ্টিনন্দন হইলেও আপনার বেশভূষা সাধকের। এইরূপ বেশভূষা, বর্তমানে, কিছু ব্যক্তি স্বীয়কে; দৈবজ্ঞ বলিয়া প্রচার করতঃ, ধারণ করে। উহারা তস্কর জাতীয়। এতদ্অঞ্চলে এইসকল ব্যক্তিদের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আপনাকে, আমি কিছু ইঙ্গরেজী বেশভূষা প্রদান করিতেছি। বর্তমানে এই জম্বুদ্বীপ ইঙ্গরেজী কবলমুক্ত। জম্বুদ্বীপের এই অঞ্চলটি, আপনি যাহাকে "বঙ্গদেশ" বলিয়া জানেন, তাহা দ্বিখণ্ডিত। বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলটি বর্তমানে "বাংলাদেশ" নামক একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র।

দেবোপম পুরুষের দীর্ঘ ভাষণ শ্রবণে, রামদাস ক্লান্তি বোধ করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন -

হে মহাপুরুষ! আমি, অকন্টকে ও সুখে যোগনিদ্রায় সমাহিত ছিলাম। অপরাপর লোকে, যেরূপ পার্থিব সুখসম্ভোগের অভিলাষ করে, তাহা হইতে মুক্তি পাইতে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লভিবার জন্য, আমি এই সাধনায় রত এবং তদ্বিষয়ে পূর্ণাভিলাষ পাইতে ইচ্ছুক! আমাকে এই চরম, সর্বজনপ্রার্থনীয়, অনির্বচনীয় সুখ হইতে কেন বঞ্চিত করিতেছেন?

দেবোপম পুরুষ কহিলেন - হে তপস্বী! আপনি বিচলিত হইবেন না! যথাসময়ে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। বর্তমানে আপনি ক্লান্ত! আমি যোগবলে আপনার শয়নের ব্যবস্থা করিতেছি। গভীর নিদ্রা সহকারে আপনি অবশিষ্ট রাত্রিযাপন করুন। আমি, প্রভাতে আপনার কল্যবর্ত লইয়া আসিব। তৎপরে, আপনার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিব।

এই বলিয়া, দেবোপম পুরুষটি অন্তর্হিত হইলে পর রামদাস তপস্বী সেই দেবোপম পুরুষের কৃত ব্যবস্থাতে গভীরভাবে নিদ্রাকর্ষিত হইয়া শয়ন করিলেন।

প্রভাতে রামদাস তপস্বীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে হইবে। সেই দেবপোম পুরুষটি পুনরায় আবির্ভূত হইলেন।

কহিলেন - হে সাধু! আপনার বিপরীতে যে কক্ষটি দেখিতেছেন, তাহাতে প্রবেশ করুন। কক্ষটিতে উষ্ণ এবং শীতল জলের, মলত্যাগের প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থাদি উপস্থিত।

রামদাস কহিলেন - মহাশয়, কিন্তু এই স্থানটিকে কি বলে?

- ইহাকে ইঙ্গরেজীয় ভাষায় হোটেল কহে। যাহাকে আপনি সরাইখানা কহেন। বর্তমানে বঙ্গীয়গণ আর সরাইখানা শব্দটি ব্যবহার করেন না! হোটেল শব্দটিও সর্বজনসম্মতভাবে বঙ্গভাষায় স্থান করিয়া লইয়াছে। আর যে কক্ষটির কথা কহিলাম, তাহাকে বাথরুম বা টয়লেট কহে। উভয় শব্দই-ইংলণ্ডীয় যাবনিক!

রামদাসের তলদেশের চাপ অসহ্য হওয়াতে, সত্বর ওই বাথরুমে প্রবেশ করিলেন।

চাপমুক্ত হওয়ার পর, রামদাসের জলের প্রয়োজন। স্নানও করিবেন!! কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না, কোথা হইতে জল পাওয়া যাইবে!! অগ্রভাগে একটি বর্তুলাকার শিরস্ত্রাণ সহ নালিকা রহিয়াছে। অন্যমনস্ক ভাবে সেই বর্তুলাকার শিরস্ত্রাণটি দক্ষিণাবর্তভাবে ঘুরাইতেই, ধারাপাতের ন্যায়, অবিরাম জল পড়িতে লাগিল। রামদাস, পরিচ্ছন্ন হইলেন। দন্তমার্জন করিতে হইবে! নিকটে দেখিতে পাইলেন একটি মুকুর! উহাতে, কঙ্কতিকা সহ আরও কিছু পদার্থ রহিয়াছে। বুঝিতে পারিতেছেন না কি করিবেন! অকস্মাৎ দৈববাণী হইল! (পরে জানিয়াছিলেন- উহা ইঙ্গরেজীয় ভাষায় “বক্স”)

“মহাশয়, আপনার সামনে একটি নাতিদীর্ঘ বর্তুলাকার, রক্তিম শিরস্ত্রাণ সহ পদার্থ রহিয়াছে। উহাকে ‘টুথপেস্ট’ কহে। আরও একটি অনতিদীর্ঘ বস্তু রহিয়াছে - উহাকে ‘টুথব্রাশ’ কহে। ‘টুথব্রাশ

এ 'টুথপেস্ট' লইয়া দন্তমার্জন করুন।" রামদাস আশ্চর্য হইলেন! নিম্ববৃক্ষের নাতিদীর্ঘ শাখার প্রয়োজন দন্তমার্জনে আর নাই !

অতঃপর স্নান করিতে হইবে। উঠিয়া দেখিতে পাইলেন - অবিকল সেইরূপ আরও একটি বর্তুলাকার শিরস্ত্রাণ! সেইটি আবার, দক্ষিণাবর্তভাবে আবর্তন করিতেই, ধারাপাতের ন্যায় তাঁহার মস্তকের উপর জল পতিত হইতে লাগিল !

অহো! বাথরুমের কি মহিমা!

নিকটে পুষ্করণী, দীঘি বা নদী নাই, তথাপি জলধারা! ইহারা কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে? যদি, তাহাই হয়, তা হইলে আর আত্মার হিতসাধনে কষ্ট করিয়া সাধনার প্রয়োজন কি?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, পুনরায় বামাবর্ত ভাবে বর্তুলাকার শিরস্ত্রাণটি আবর্তন করিলেন। জলপ্রপাত বন্ধ হইল। রামদাস আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইলেন। এক্ষণে, গাত্রমার্জন করিতে হইবে! নিকটেই একটি কুলুঙ্গি সদৃশ থাকে কার্পাস বস্ত্র দেখিতে পাইলেন! উহা দ্বারাই গাত্রমার্জন সম্পূর্ণ হইল। ওই কার্পাস বস্ত্রটিই পরিধান করিয়া তিনি 'বাথরুম' হইতে নির্গত হইলেন!

নির্গত হইতেই রামদাস দেখিলেন, সেই দেবপোম পুরুষটি একটি অন্যরকমের কেদারাতে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার সন্মুখে একটি কাষ্ঠনির্মিত উচ্চাসন। তদুপরি বিভিন্ন স্ফটিক সদৃশ থালিকায় প্রভূত খাদ্যবস্তু ! তবে, একমাত্র অণ্ড ব্যতীত সবই তাঁহার অজানা। স্ফটিক সদৃশ কিছু উচ্চ পাত্রে বিভিন্ন বর্ণের জলীয় পদার্থ রহিয়াছে। একটি থালিকায় পীতবর্ণের গোলাকার ভর্জিত বস্তু রহিয়াছে! তাহার উপর পলাণ্ডু ও মরিচের ফালিকা শোভাবর্দ্ধন করতঃ, সুঘ্রাণে, কক্ষটি আমোদিত!

ত্রিকোণাকার বেশ কয়েকটি শুভ্র বস্তু দেখিতে পাইলেন। বাকিগুলি, খাদ্যগ্রহণকালে জানিয়া লইবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। গতরাত্রে, ফলাহার করিয়া, ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলেও, উদরপূর্ত্তি হয় নাই!

স্নানান্তে, অলক অবিন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি অদূরেই দেখিলেন, একটি উচ্চাসনে মুকুর এবং কঙ্কতিকা! মুকুরের সন্মুখে, তিনি কঙ্কতিকা সহযোগে কেশ পারিপাট্য সমাপন করিলেন।

দেবপোম পুরুষটি আরেকটি কেদারা রামদাসের সন্মুখে রাখিলেন। রামদাস অবাক হইয়া দেখিলেন - কেদারার তলদেশে চারিটি চক্র রহিয়াছে। বিস্ময় আর প্রকাশ করিলেন না। বুঝিলেন - আরও বিস্ময় বাকি রহিয়াছে।

দেবপোম পুরুষটি কহিলেন - প্রভু রামদাস! আপনি কি কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করিবেন?

রামদাস কহিলেন - শাস্ত্রে, বিবিধ মাংসাদি ভক্ষণের উপর কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা নাই! তবে, উহা ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে এবং স্ত্রীপশুর মাংস ভক্ষণ নিষেধ।

- আপনি যদি এই বিষয়ে আলোকপাত করেন, তাহা হইলে দেবকুলও বাধিত হইবে।

- বিভিন্ন শক্তিপূজাতে যে অষ্টবিধ মহামাংস নিবেদন করিবার প্রথা আছে, তন্মধ্যে প্রথমেই বিধান রহিয়াছে; গোমাংসের! তবে, বর্তমানে আমি ক্ষুধার্ত। কল্যবর্ত্য ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি পূর্বক আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিব।

- মহাশয়, কল্যবর্ত্য কহিলে কেহ বুঝিবে না! ইহাকে বর্তমানে বঙ্গীয় সমাজ 'ব্রেকফাস্ট' কহে।

প্রথমেই রামদাস বলিলেন - আমি পিপাসার্ত! কিরূপ পানীয় গ্রহণ করিতে পারি?

- আপনি, আপনার সন্মুখে যে পানপাত্রগুলি দর্শন করিতেছেন, তাহাতে বিবিধ পানীয় রহিয়াছে। ইচ্ছামত পান করুন।

- বুঝিলাম। কিন্তু এই স্ফটিক সদৃশ পানপাত্রগুলিকে বর্তমান বঙ্গীয় সমাজ কি নামকরণ করিয়াছে?

- ইঙ্গরেজীয় ভাষায় ইহাদিগকে 'গ্লাস' বলে। কিন্তু, ইহা সমধিক পরিচিত গেলাস হিসাবে।

- কারণ?

- উচ্চারণে জিহ্বার জড়তা হেতু! আপনি সম্যক রূপে অবগত আছেন, বঙ্গীয় সমাজ আলস্যপ্রিয়, সেইহেতু, জিহ্বাতেও আলস্য প্রতীয়মান!

- হুম! ওই গ্লাসে পীত বর্ণের তরল পদার্থটি কি পানীয়!

- হ্যাঁ! তপস্বী! উহা সহকার নির্য্যাস। ব্রেকফাষ্ট গ্রহণকালে নির্য্যাস অবশ্য গ্রহণীয়।

- সহকারের অর্থ যে আম্র, তাহা কি বঙ্গীয় সমাজের বিদিত না, অবিদিত!

- সাধারণ বঙ্গীয় সমাজ বর্তমানে সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম নহে। ইঙ্গরেজীয় ভাষা শিক্ষা করিতে গিয়া, তাহাও সম্যক রূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, আর মাতৃভাষাও সম্যক কহিতে পারে না! সংস্কৃতের দিন অস্ত গিয়াছে! কতিপয় লোক ইহাকে শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন বটে, তবে তাহাদের মানসিক ভারসাম্যহীন রূপে প্রতীয়মান করিতে সবাই সচেষ্ট।

- কিছু বর্তমান বাংলা ভাষার উদাহরণ দিতে পারিবেন?

- স্বচ্ছন্দে!

- বলুন। অবগত হই!

- প্রথমেই আমি শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজের বাংলার উদাহরণ দিতেছি। সম্যক শ্রবণ করুন।

- যথা ?

- আমাদের এই পুওর ইণ্ডিয়াতে, কাল্টিভেশন অ্যাণ্ড ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন সাইমেলটেনিয়াসলি মেনটেইন করা উচিত।

- আমি তো মাত্র চারটি বাংলা শব্দ বুঝিতে পারিলাম। 'আমাদের', 'এই', 'করা' এবং 'উচিত'। বাকিগুলি মনে হয় ইঙ্গরেজীয় ভাষা। যোগনিদ্রায় যাইবার পূর্বে এই শব্দগুলি শুনিয়াছিলাম, এমত বোধ হইতেছে।

- ঠিক, প্রভু! ইণ্ডিয়া অর্থ ভারত, কাল্টিভেশন অর্থ কৃষি, অ্যাণ্ড অর্থ এবং, ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অর্থ শিল্পায়ন, সাইমেলটেনিয়াসলি অর্থ একসঙ্গে, মেনটেইন অর্থ পালন করা।

- হুম! এযে কৃষরান্ন!!

- হ্যাঁ প্রভু! খিচুড়িই বটে! কৃষরান্ন অর্থাৎ খিচুড়ি খাইতে যেরূপ সুমধুর, সেইরূপ এই কৃষরান্ন স্বরূপ বাক্যগুলি অনর্থক কর্ণ কণ্ডুয়ন করে!!

- হুম! বুঝিলাম!

রামদাস পানপাত্রের সহকার নির্য্যাস কিছুটা গ্রহণ পূর্বক বলিলেন।

- মহোদয়! আপনি অপরাপর বর্তমান বঙ্গভাষার উদাহরণ দিন!

- কাল যা কিচাইন হলো না মাইরি! বাড়ীতে বডি গ্যারেজ করেছি আর শালার বউ আমার ঘ্যাচাং করে ধরেছে! প্রচুর মাল টেনেছিলাম তো! কি কেলো!! আমি শালা খণ্ড ত। বউয়ের কাছে আর মাইরি পেঁয়াজি করতে পারলাম না! কোথায় শালা মাল খেয়ে - দিল বাগ বাগ হয়ে যাবে, তা নয় - হোল নাইট খালি ভ্যাদারাং ভ্যাদারাং শুনে লাইফটা হেল হয়ে গেল!

- হুম। অর্থ বলুন!

- হে তপস্বী! ইহার অর্থ কহিতে গেলে আমি নিজেই অযোগবাহ বর্ণ হইয়া যাইব। আপনি বরং মৎ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ইহার অর্থ বুঝিয়া লহেন।

- হুম! বুঝিলাম। কিন্তু এইরূপ ভাষা প্রয়োগের কারণ?

- শ্লা! গুষ্ঠি মারি তোর এই কারণের!!

- ইহা কি ভদ্রজনোচিত ভাষা?

- না প্রভু! ইতরজনের ভাষা বা কহিতে পারেন - সুরাপানের প্রভাবের ফল!

- আপনি কি প্রভাতেই সুরাপান করিয়াছেন?

- কি করিতে পারিতাম প্রভু! ইঙ্গরেজীয় ভাষায় একটি প্রবাদ আছে – আ ম্যান ইজ নোন বাই দ্য কম্প্যানি হি কিপস্ !

- আপনার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইহার অর্থ বুঝিলাম! কিন্তু, এ স্থলে যে কম্প্যানি শব্দটির প্রয়োগ করিলেন, তাহা কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি?

- নিকুচি করেছে (স্বগতোক্তি) প্রভু, আপনি কি স্যাণ্ডউইচ ভক্ষণ করিবেন না?

- স্যাণ্ডউইচ? অর্থাৎ বালির ডাইনি?

- এই গেঁড়েটাকে আমার ক্ষমতা দেওয়াটাই ভুল হয়েছে!

- কিছু কি কহিলেন?

- না! না! ওই ত্রিকোণাকার বস্তুটি স্যাণ্ডউইচ! দুখানি ব্রেডের ভেতর কুক্কুট মাংসের পুরু স্তর!

- বেড না ব্রেড!

- পূর্বে, পর্তুগীজ প্রভাবে ইঙ্গরেজীয়রা ইহাকে লোফ কহিত। বর্তমানে ইহাকে ব্রেড কহিয়া থাকে! (বুঝলিরে গেঁড়ে ! উফ্)

রামদাস সেই দেবোপম পুরুষটিকে কহিলেন - প্রভু, আপনার শুভ নামটি জানিতে পারি কি?

- আমি সোমদত্ত! এই নিন আমার কার্ড।

রামদাস চমকিত হইয়া, সেই আয়তাকার কাগজটি গ্রহণ পূর্বক, প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিলেন না! পরে, সোমদত্ত প্রদত্ত ক্ষমতা বলে পড়িতে পারিলেন। চমৎকার ভাবে লেখা আছে -

SOMDUTTA

Correspondent and Adviser to Lord Shiva

(Region: – West Bengal, India, Earth)

Cell # 0000420840 (Toll free)

রামদাস কহিলেন

- মহাশয়, আপনার হস্তলিপি মনোহর, ইহাতে সন্দেহ নাই!

- প্রভু, আপনার প্রমাদ হইতেছে। ইহা স্বীয় হস্তলিপি নহে! যন্ত্রগণকের দ্বারা মুদ্রিত।

- অতীব আশ্চর্যের! এই যন্ত্রগণক কি?

- প্রভু! আপনার ব্যাকরণ জ্ঞান প্রশ্নাতীত! পাণিণির প্রত্যাহার সূত্রের অবলম্বনে এই যন্ত্রগণক নির্মিত। এই যন্ত্রগণক; দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, উরগ, প্রভৃতির দ্বারা প্রকীর্ত্তিত। যন্ত্রগণক, সত্য-

পবিত্র-মঙ্গলপ্রদ-পরিচ্ছেদাতীত-কালত্রয়ে অধিকৃত-জ্যোর্তিময়-সনাতন। পণ্ডিতেরা এই যন্ত্রগণকের অলৌকিক কর্মসকল কীর্তন করিয়া থাকেন। যতিগণের আর সমাহিত হইবার প্রয়োজন পড়ে না।

- তাহার পর?

- ধ্যান এবং যোগবলের আর প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতেরা এই যন্ত্রগণকের দ্বারা দর্পণতলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় নিজেকে প্রত্যক্ষ করেন।

রামদাস দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ পূর্বক এই যন্ত্রগণকের প্রতি মোহাবিষ্ট হইয়া কহিলেন

- সোমদত্ত, আমি বৃথাই যোগনিদ্রায় সমাহিত ছিলাম। এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং রসনাসুখকর এই সব খাদ্যসম্ভারে উদর পূর্তি হইয়াছে। এক্ষণে, স্বীয় কর্তব্য কি?

সোমদত্ত কহিলেন

- হে তপস্বী, আপনাকে প্রথমে বেশভূষা বদল করিতে হইবে। আমি, আপনার নিমিত্ত বর্তমান বঙ্গীয় সমাজ যে সকল বেশ পরিধান করে, তাহা লইয়া আসিয়াছি!

- কি বার্তা শুনাইলেন!

- হ্যাঁ প্রভু! বর্তমানে বঙ্গীয় সমাজ আর ধুতি, শাড়ি, মেরজাই পরিধান করেন না!

- পরিবর্তে কি পরিধান করেন, তাঁহারা?

- বর্তমানে, ইউনিসেক্স বেশ প্রকীর্তিত।

- এই ইউনিসেক্স কি?

- ইউনিসেক্স অর্থ - উভলিঙ্গ। এই সকল বেশ পরিধান করিলে, পশ্চাৎ ভাগ হইতে, কে মহিলা আর কেই বা পুরুষ; নির্ধারণ করিতে পারিবেন না ! পুরুষগণ মহিলাদের ন্যায় অলকরাজি বিস্তৃত করিয়া রাখেন আর মহিলারা পুরুষগণের ন্যায় দামসকল মস্তকে শোভিত রাখেন। আপনি, শাস্ত্রজ্ঞ-মেধাবী-বুদ্ধিমান-ত্রিগুণাতীত ও পরম প্রাজ্ঞ। আপনাকে আর অধিক কি কহিব?

- হুম! ধুতি, শাড়ি, মেরজাই - তোমাদের দিন গিয়াছে!

- না প্রভু! দিন যে চলিয়া গিয়াছে, এমত নহে! কেবল - বিবাহ, রবীন্দ্রজন্মদিনে, একলা বৈশাখে থুড়ি পয়লা বৈশাখে, দোলপূর্ণিমায় এবং কিছু কিছু বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে, শিক্ষক/শিক্ষিকা, অধ্যাপক/অধ্যাপিকাগণ এই সমস্ত পরিধান করেন। মনে রাখিবার জন্য ইঁহারা সর্বদা সচেষ্ট!

- হুম! দাও কি লইয়া আসিয়াছ!

সোমদত্ত কহিলেন

- প্রভু, আপনাকে একটি দুঃসংবাদ দিই! এই কলিকাতা নগরে, ঘনা ভশ্চাজ নামক এক দুষ্কৃতি যন্ত্রগণকের দ্বারা আমাদের এই সকল কার্যকলাপ এবং বার্তাসকল লোকচক্ষে আনিবার নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিতেছে।

- এই ঘনা ভশ্চাজটি কি রকম ব্যক্তি?

- মহামূর্খ-চতুর। নিজেকে মহাপণ্ডিত ভাবে! গদ্য একেবারেই লিখিতে পারে না! অথচ আমাদের কথপোকথন লিপিবদ্ধ করিতেছে। তৎসম শব্দবহুল এই সকল কথপোকথন সঠিক লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে কিনা, সন্দেহ আছে। তদুপরি, সুরাপ্রভাবে তাহার নয়নদ্বয় সর্বদা পঞ্চদল বজ্রপুষ্পের ন্যায় রক্তিম!! অতএব আমরা বর্তমান বাংলা ভাষায় কথপোকথন করিলে উত্তম হইবে।

- এই ঘনা ভশ্চাজটিকে রোধ করা যাইবে না?

- অসম্ভব! যন্ত্রগণকের অপার বলে, সে বলীয়ান! ইতমধ্যেই সে আমাকে দূরভাষে, পঞ্চদল বজ্রপুষ্পের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছে!

- তুমি কি উত্তর দিলে?

- কি আর বলব? বললাম - ওরে ঘনা!! পঞ্চদল বজ্রপুষ্পের মানে হলো পাঁচ পাপড়ির জবাফুল!

রামদাস বললেন -

- আচ্ছা! এই ঘনা ভশ্চাজের জীবিকা কি?

- পুরুতগিরি!

- বলো কি হে!

- হ্যাঁ! ঠিকই বলছি! সরস্বতী আর লক্ষ্মী পূজোর সময়ে পুরুতের অভাব পড়ে! বুইলেন তো!

- হুম!

- তো সেই সময়, ব্যাটা সারা বছরের ইনকামটা করে নেয়!

- কি রকম?

- আমি একবার গিয়েছিলাম, পুজো করাতে!

- কি বলল?

- বলল, দক্ষিণা কত?

- কত দিতে হবে?

- হাজার টাকা আর ঠিক আড়াই মিনিট পুজো করবো, রাজি?

- তুমি রাজি হলে?

- উপায় কি বলুন? কোনো পুরুতই তো আর রাজি হয় না!

- তারপর?

- ব্যাটা তো, সকাল ৮ টায় আসবে বলে, বেলা ১২ টায় এল! এসেই ভুলভাল মন্ত্র পড়া শুরু! তো আমি বললাম - ঘনাদা আপনি মন্ত্রের মানে জানেন?

- কি বলল?

- বলল, হ্যাঁ জানি!

- তো কি বলল?

- বলবে আর কি? ব্যাটা চশমখোর! বলে কি - আরও পাঁচশ টাকা লাগবে!

- কি বললে তুমি ?

- রাজি হলাম, ওর বিদ্যের দৌড়টা দেখতে!

- শুরু করল! ওঁ বিষ্ণু, তদ্বিষ্ণুঃ পরমংপ্রদং, সদা পশ্যন্তি শুরয়, দিবীব চক্ষুরাততম্।

- মানেটা কি বলল?

- ওঁ বিষ্ণু = একটা বাঁশ, তদ্বিষ্ণুঃ পরমংপ্রদং = তার চেয়েও বড় বাঁশ পরমভাবে প্রদান কর, সদা পশ্যন্তি শুরয় = সব সময় দেখে শুনে দিবি, দিবীব চক্ষুরাততম্ = দিবি, দিবি, চক্ষুলজ্জা করবি না!

- আমি বললাম, এটা কি হল?

- বলল, কি আর হবে? তোকে বাঁশ দিয়ে দেড়হাজার টাকা গাপ করে দিলাম! আমাদের ঋষি-মুনিরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন।

আমার মা বলল- ঘনাদা, একটু ফল টল খেয়ে যান!

কি বলল জানেন?

কি?

বলল - কর্মণ্যে বাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন!

মা গদগদ হয়ে বলল - এর মানে কি, ঘনাদা?

কর্মে অকর্মণ্য হয়ে পড়লে মাকে আর ফল দেবে না!

মা খুশি হয়ে আরও পাঁচশ টাকা দিয়ে দিল!

বল কি হে!!

তবে, আর বলছি কি? তবে. রামদাসবাবু, আর পি এন পি সি নয়, যান, এবার ড্রেস আপ করে নিন।

সোমদত্ত, রামদাসের দিকে প্রথমে একটি আট পকেটের ফেডেড জিন্সের ট্রাউজার এগিয়ে দিল!

রামদাস জিজ্ঞেস করলেন - কিভাবে পরিধান করিব?

- আবার সাধু বাংলা বলে!! ও! ও! ও!

- আচ্ছা, আচ্ছা, চালু বাংলাই বলছি, কিন্তু ওই ও! ও! ও! টা কি?

- বকা দিলাম আপনাকে!

- বুঝেছি! কিন্তু কোমরে যে ঢলঢল করছে!

- কুছ পরোয়া নেহি! আমি আপনাকে বেল্ট পরিয়ে দিচ্ছি!

- বেল্ট?

- আরে বাবা, চর্ম কোমরবন্ধনী!

- আচ্ছা!

- এই নিন লাল টি-শার্ট...

- পরলাম!

- এই নিন গগলস্!

- এটা আবার কি?

- রোদচশমা! যাতে রোদ চোখে না লাগে! তাছাড়া আপনাকে বেশ স্মার্ট লাগবে!

- বেশ!

- বাঃ! আপনাকে তো এ্যাকেবারে যৌবনের উত্তমকুমার লাগছে!

- উত্তমকুমার?

- সে অনেক কথা! তবে উনি কিন্তু এখনও বাঙালি এবং বাংলার নয়নের মণি! উনি একজন মহাগুরু অভিনেতা! এখন অবশ্য একজন আছেন!

- কে!

- পোসেনজিৎ।

- সেটা আবার কে?

- ওই অভিনেতা! তবে ইদানিং লালন ফকির, জাতিস্মর প্রভৃতি করে বেশ নাম করেছে।

- আচ্ছা, আচ্ছা!

- কিন্তু, রামদাস বাবু, আপনাকে কিন্তু ঝক্কাস লাগছে! মেয়েরা আপনাকে দেখলে এ্যাকেবারে চটকে চৌষট্টি হয়ে যাবে!

- ঝক্কাস!! চটকে চৌষট্টি!!

- এসব, এখন বাংলা এবং বাঙালির নতুন লব্জ!

- আরও কিছু বল তো সোম, শিখে নি!

- হুম! বিন্দাস লাইফ, লাইফ ঘেঁটে গেছে, কেস জণ্ডিস, ইলু ইলু, খাল খিঁচে নেওয়া। এরকম আরও অনেক আছে! কত আর বলব?

- আচ্ছা, আচ্ছা!

- আপনি ট্রাউজারসের জিপটা লাগিয়ে নিন!

- সেটা আবার কি?

- ঠিক আছে, আমিই লাগিয়ে দিচ্ছি। বলে জিপটা টেনে দিল সোমদত্ত!

রামদাস বেশ অবাক হলেও দুঃখ পেলেন না! দেশাচার, সময়াচার - সবই মানতে হবে! যুগের নিয়মও তাই! না হলে যে মডার্ন হওয়া হবে না!

বেশ আনন্দেই সোমের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, রামদাস!! পায়ে নাইকির স্নিকার! হাঁটতে কোনও কষ্টই হচ্ছে না! বেশ আরাম। আগের মত আর পায়ে কাটার ভয়ও নেই।

হোটেলের ঠাণ্ডা থেকে বেরুতেই, একঝলক গরম হাওয়া এসে তাঁর মুখে ধাক্কা মারল! সোম বলল - এসি থেকে বেরিয়েছেন তো! একটু কষ্ট তো হবেই!

চারপাশে অজস্র চিৎকার আর বিভিন্ন রকমের গাড়ির আওয়াজে এক অসহ্য শব্দ! কর্ণপটহ বিদারিত হইতেছে! থুড়ি কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে! চারিদিকে রঙিন কাগজ লাগানো!

সোমের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলেন, এগুলো ভোটের পোষ্টার! ভোট কি, আর পোষ্টারও কি জেনে নিলেন!

আচ্ছা, সোম এই যে ভোট টা হচ্ছে; এটা তো একটা লড়াই! তাই তো?

হুম! ঠিকই ধরেছেন!

তা কার, কার মধ্যে লড়াই?

সোম জবাব দেওয়ার আগেই, বিকট আওয়াজে একটা গান ভেসে এলো!

‘লুঙ্গিডান্স, লুঙ্গিডান্স’

- এটা কিসের গান? সোমদত্ত?

- হিন্দি আধুনিক সিনেমার গান!

- আমাদের সময়ের বাংলা টপ্পা, কবির লড়াই - এসব কি উঠে গেছে!

- টপ্পাটা রামকুমারবাবু বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু তিনি গত হবার পর আর চল নেই!

- এখনকার কিছু গান বলবে?

- বলাই যায়! 'তোমার দেখা নাই রে'!

- কার দেখা নেই?

- সেটা তো কারও জানা নেই, তবে 'দুধওয়ালার গোঁফে মাছি', এটা জানি!

- এই সব কি ভাবে বাজানো হয়?

- আগে কলের গান বলতো তবে আজকাল বলে সিডি প্লেয়ার! তাই এগুলো গানের বদলে GUN !

- তা এনাদের কি, গায়ক বলা হয়!

- আরে না না! এরাও ইউনিসেক্স! এরা GUNNER নামে পরিচিত!

- হুম! তোমার এই GUN এবং GUNNER এর গুঁতোয় আমি ভোটের লড়াইটা কাদের মধ্যে, সেটা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেছিলাম। একটু বলবে?

- ওটাই তো! আমরা তো বুঝতেই পারছি না! আর সেই জন্যই তো আপনাকে ডাকা! যদি কিছু বুঝতে পারেন! তাই, আমার বস্ শিবুদা আপনাকে যোগনিদ্রা থেকে উঠিয়েছেন!

- শিবুদা?

- ওই দেবাদিদেব মহেশ্বর!

- তাই বলে, শিবুদা!

- দেখুন, আজকাল সব দাদা, দিদিদের যুগ! তাই, শিবুদা!

রামদাস, আর অবাক হচ্ছেন না! হাঁটতে, হাঁটতে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন!

ঘরের ওপরে লেখা আছে 'নির্বাচনী কার্যালয়'। সোমদত্তের সঙ্গে ঢুকে পড়লেন, রামদাস!

কয়েকজন ছেলে-ছোকরা, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল! ওঁদের দেখে একজন বলে উঠল-

- আবে! তোরা কে বে?

- আমরা, আপনাদের এই নির্বাচনী কার্যালয় দেখতে এসেছি!

- এটা দেখার কি আছে বে? তৃতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অফিস! বুয়েছিস?

- স্বাধীনতা সংগ্রাম?

- এলোমেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই! এবার আমাদের লুটের পালা! তাই, স্বাধীনতা সংগ্রাম!!

- বৎসগণ! স্বাধীনতা সংগ্রাম মানেই কি লুট?

- আব্বে! বেশি জ্ঞান মারাস না তো!! এটা পরিবর্তনের যুগ!

- তাহা তো বুঝিলাম! কিন্তু, পরিবর্তন তো প্রচুর হইয়াছে, বৎস!

- ক্কি! কোত্থেকে এয়েছিস বে, লালটু সেজে! কি ভাষায় কথা বলছিস! সব শ্লা, মাথার ওপর পিলেন হয়ে উড়ে যাচ্চে! ঠিক করে কথা বলতো!

সোমদত্ত, রামদাসকে বের করে নিয়ে এলেন! বললেন – নাঃ! আপনার দেখছি কাণ্ডজ্ঞান নেই! এবারই ক্যালানি খেতেন!

- ক্যালানি?

- হ্যাঁ! ক্যালানি!!

- সেটা কি?

- মার! আজকাল আর একটা লব্জ হয়েছে, খিস্তি আর ক্যালানির বিকল্প নেই!

রামদাস প্রতিজ্ঞাই করেছেন, আর অবাক হবেন না! হাঁটতে থাকলেন! কিছু দূরে আর একটি 'নির্বাচনী কার্যালয়'। ওঁদের দেখে, এখানকার লোকেরা একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন!

- আপনারা কারা? নির্বাচন কমিশনের লোক?

- না না! আপনারা বিচলিত হবেন না! আমরা দেখতে বেরিয়েছি, এই ভোটের বাজার!

- ও! ও! আপনারা বাজারী কাগজের লোক?

- মানে?

- ও সব ভ্যানতাড়া করবেন না! আমরা বুঝি, কে কিভাবে এখানে আসে! গত ৩৫ বছর আমরা জনগণের সঙ্গে আছি। আমরা জনগণ দেখলেই বুঝি! আমরা না ওরা! খালি, মাঝে একটু গড়বড় হয়েছে, তবে ম্যানেজ করে নেব এই ভোটে।

- আমরা না ওরা!

- হ্যাঁ! আমরা না ওরা! যে জনগণ আমাদের সাথে আছে, তারাই আমরা! আর যারা নেই, তারাই ওরা! এই ‘ওরা’ দের ওপর আমাদের মাতব্বরি জন্মগত অধিকার! অধিকারের জন্য আমাদের লড়াই! এই লড়াইয়ের জন্য আমরা এবারও জিতব! সব মানুষকে ‘অধিকার’ পাইয়ে দেওয়াই আমাদের ‘বিপ্লব’!

- আপনারা কি শাক্ত?

- এটা আবার কি! খায় না মাথায় দেয়?

- মানে, আপনারা কি শক্তির পূজারী?

- আরে না! শক্তি তো ওনাদের একচেটিয়া!

- না! আমি ঠিক ওটা বোঝাতে চাই নি! আমি, বলছি- আপনারা কি দেবীর পূজা করেন?

- বুঝেছি! আপনি ম্যাও!

- না মহাশয়! আমি মার্জার নই!

- আমরা মার্জারিত নই! জর্জরিত! ওই ম্যাওরা! না থাক! আপনারা সব দালাল! বুর্জোয়াদের! আমরা নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি!

এত কথা বলে, লোকটি একটি ক্লাসিক সিগারেট ধরালেন!

রামদাসের মনে পড়িল - “চতুর্ণামপি বর্ণণামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ”। কলিকালে, চারিবর্ণেরই এই সকল সনাতন ধর্ম্ম! ব্যাখ্যাও, মনে পড়িল। ইহারা নিরন্তর পাপকর্মকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে।

তাঁহার আরও কিছু মনে পড়িল।

“কৃষিবদ্বাণিজ্যশিল্পয়োরপি কলৌ বর্ণচতুস্টয় সাধারণ ধর্ম্মত্বং দর্শয়িতুং বাণিজ্য শিল্পকমিত্যুক্তম্।”

সংক্ষেপে, কলিযুগে কৃষির ন্যায় বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম।

ইহাতে দোষের কি হইল? উভয় পক্ষ কি পরাশর সংহিতা আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়াছেন? না, অনিষ্ট বিষয়েই যথেষ্ট চেষ্টা?

উভয় পক্ষের-ই কি শিষ্টসমাজে বিশিষ্ট গণ্য হইতে কি অনিষ্টে নিবিষ্টই উৎকৃষ্ট লক্ষণ?

রামদাসকে অন্যমনস্ক দেখে, সোমদত্ত সবই বুঝতে পারল!

- চলুন! সিগারেট খাবেন?

- সিগারেট কি?

- শ্বেত ধূম্রশলাকা! তাম্বাকু সহ গোলাকার বস্তু!

- হুম! চলুন। আজকাল তো আর হুঁকো পাওয়া যায় না! একটু মগজে ধোঁয়া দিলে যদি মাথাটা চাঙ্গা হয়!

- চলুন দোকানে! ও ভাই! দুটো ভালো সিগারেট দেখি!

- এই নিন! কিন্তু, ৫ টাকার বদলে ৭ টাকা দেবেন!

- কেন ভাই? বাজেটে তো সিগারেটের দাম বাড়েনি!

- আরে, জানেন না? এখন গৌরী সেন আর টাকা দিচ্ছে না, তাই ট্যাক্সো!! নেবেন তো নিন! না হলে বেশি বিলা করবেন না!

আপণালয়ের সত্বাধিকারীর এইরূপ বাক্যপ্রয়োগে, রামদাস, পুনরায় ব্যথিত হইলেন। মহামতি মনুর শ্লোক মনে পড়িল।

"প্রিয় বাক্য প্রদানেন সর্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।

তস্মাত্তদেব বক্তব্যং বচনে কা দরিদ্রতা।।"

প্রিয় বাক্য বললে, মানুষ তো কোন ছার! পশুপাখিও তুষ্ট হয়! তাই প্রিয় বাক্য প্রয়োগই উচিত, ইহাতে কৃপণতা বা দারিদ্র্য কিসের?

আগেই জেনেছিলেন - লাউডস্পিকারের সাহায্যে বক্তব্য আরও পরিষ্কার এবং জোরে শোনা যায়!

কিন্তু, এ কি? এরা তো একে অপরকে নিন্দা এবং গালিগালাজেই ব্যস্ত!

"সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যে হীতকরং বদ্যেৎ।

আত্মোৎকর্ষন্তয়া নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ।।"

সজ্জন ব্যক্তি, সর্বদা বিনম্রভাবে, সত্য, প্রিয় এবং কেবল লোকের হিতকারী হয়, এমন বাক্যেই কথা বলবেন। তিনি, নিজের যেমন প্রশংসা করবেন না, তেমনি অপরের সমালোচনা বর্জন করবেন।

কিন্তু, নিন্দা সমালোচনা করিতেই হয় তাহা হইলে?

এক্ষেত্রে, ব্যক্তির গুণের প্রশংসা অগ্রভাগে করে, অতি স্নেহের সঙ্গে কাজের গঠনমূলক ভাবনা সহ নিন্দা করা উচিত!

রামদাস বুঝলেন - এখন, একে অপরের নিন্দাই করবে। মরে গেলেও অপরের প্রশংসা করবে না! এই ভাবে কি রাষ্ট্র চলে? সমস্ত প্রজা এই সংস্কৃতিতেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে, আর হয়েছে-ও!

তারই প্রতিফলন- রাজ্য পরিচালনা, শিক্ষা এবং সব ক্ষেত্রেই!

হা হতোস্মি!!

যুগ-যুগান্তর ধরে ক্ষমতার লড়াই চলে এসেছে! মহাভারত বা রামায়ণেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়! ছলে, বলে, কৌশলে ক্ষমতায় থাকতে, আত্মপ্রচার করা দরকার! এর জন্য, ষড়যন্ত্র, চরিত্রহনন, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, দরকার হলে গুপ্তহত্যা পর্যন্ত করতে হবে! ভারতের এটাই দস্তুর!

রামদাস, তাই বিচলিত হলেন না! মহামতি মনু, যতই স্মৃতিশাস্ত্র লিখে যান - সেটা মানার কোনও প্রয়োজনই পড়ে না!

যোগনিদ্রার যাবার আগেও, তিনি ভারতের এই অবস্থা দেখে গিয়েছিলেন।

ক্ষমতা মানেই - অর্থ, ভোগ! কিছু ব্যতিক্রমও আছে, কিন্তু কে না জানে - বিধিই, ব্যতিক্রমের নিয়ামক!

সোমদত্ত বুঝতে পারছেন, রামদাসের মনের অবস্থা!

রামদাস, বললেন - এক্ষণে, নগর কলিকাতা দর্শন এবং শাস্ত্র পাঠান্তে আমি যা বুঝিয়াছি, তাহা কথন করিতেছি। আপনি শ্রবণ করুন!

ইহলোকে, যে চারিপ্রকার যুগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শুধু মাত্র সভ্যতার মাত্রা নির্ণয়ের নিমিত্ত! আমাদের সৌভাগ্য - এই চারিযুগেই, কিছু মণীষী, যথার্থ বিদ্বান ও অপরাপর অশেষগুণালঙ্কৃত ব্যক্তিরা আবির্ভূত হইয়াছেন।

কার্যকাল সমাপ্ত হইলে - তাঁহারা লীন হইয়া যান। কিন্তু, জনসাধারণ তাঁহাদের উপদেশ স্মরণে রাখেন না!

পার্থিব সুখই তাদের কাম্য। শাস্ত্র- সাহিত্য-সঙ্গীত-বিজ্ঞান–ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও তৎপ্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, পণ্ডিতব্যক্তিগণ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাবধি তাহার নিরঙ্কুশ চর্চা চলিতেছে। ইঁহারা ক্ষমতার জন্য লালায়িত কদাপি ছিলেন না, এখনও নহেন। আমোদের সহিত লক্ষণীয়, ইঁহারা ক্ষমতাবান দ্বারা চিরকাল ব্যবহৃত। কিছু পণ্ডিত, জ্ঞানত এবং কিছু অজ্ঞানত এই ব্যবহার মানিয়া লন!

এই সকল ভাস্করতুল্য ব্যক্তিগণ, জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা বাংরবার মোহাবরণ নিরাকরণ করিয়া আমাদিগের নেত্রোল্মীলনের নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টিত।

মনুষ্যহিতকর কার্য্যসমূহ পাপজনক নহে, এই সমস্ত অসদভিপ্রায় দূষিত হইলেই পাপজনক হয়!

বর্তমানে সারা জম্বুদ্বীপ সহ এই খণ্ডিত বঙ্গদেশে যাঁহারা শাসন করিতেছেন/ করিবেন, তাঁহারা এই সমস্ত অসদভিপ্রায় দূর করিবার জন্য চেষ্টিত না হইলে; সমস্ত জনগণ-কালসর্পদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে!

অতএব, সোমদত্ত! আপনি দেবাদিদেব মহাদেবকে এই বার্তাই দিবেন।

বুঝিলাম আমার দ্বারা এই দুরূহ কার্য সমাপন করিবার নিমিত্ত, দেবাদিদেব মহাদেব আমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ করাইয়াছেন। আমি, আজি হইতে এই কার্যে ব্রতী হইলাম। আর যোগনিদ্রায় কালাতিপাত করিবো না। উহা স্বার্থপরের ন্যায় কর্ম হইবে। বুঝিলাম, মদীয় এবং জাতির মোক্ষ মানবতাকে প্রচার করা!

মানবতার জয় হউক!

সমাপতন

সিদ্ধার্থ দেব

বহু বছর পরে পার্বতীদির সঙ্গে দেখা হল। নিউ ক্যালকাটা ক্লিনিকে মাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। একটু চেক আপ করানো দরকার। বিদেশে থাকি, একমাত্র সন্তান; ছুটি ছাটায় এসে একটু কর্তব্য করার চেষ্টা করছি ! এমনিতে মা যথেষ্ট স্বাবলম্বী, বাবা চলে যাওয়ার পর নিজেরটা নিজেই সামলে নেন কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে খুব একটা নজর দেন না। বারো ঘন্টা উপোস করিয়ে নিয়ে গেছি, একটু বিরক্ত-ই। প্যাথোলজি সেকশনের বাইরে অপেক্ষা করছি, ব্লাড স্যাম্পেল দেওয়া হবে, এক প্রবীণা মহিলা, বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি হবেন, হাসি মুখে এসে মাকে প্রণাম করলেন,

"মীরামাসি, চিনতে পারছ? আমি পার্বতী"

"পার্বতী ? মানে সেই শিবতলা... ওমা কেমন আছিস ? কতদিন পর দেখলাম তোকে।" আমিও চিনতে পারলাম পার্বতীদিকে।

"তুমি কিন্তু একরকমই আছ মীরামাসি, একটুও পাল্টাওনি"

"কি যে বলিস" একটু খুশিই হলেন মা, "সত্তর বছর বয়স হল"

"মেসোমশাই কি...?"

"বাবা বছর দুয়েক আগে..." - এবার আমি উত্তর দিলাম

"ওমা এ কে ? গৌতম না কি ?" এবার আমাকে দেখতে পায় পার্বতীদি...

"এ কিরে, তোর মাথায় টাক, সেই টেরি কি হল? দেব আনন্দের মত?"

মনটা হঠাৎ খুশিতে ভরে গেল, তার মানে পার্বতীদি মনে রেখেছে আমায়।

"তুই তো সাংবাদিক? তাই না? দাদার কাছে শুনেছিলাম। কোন কাগজে যেন কাজ করিস ? কলকাতাতেই তো শুনেছিলাম ?"

"না ওটা ছেড়ে দিয়েছি বছর পাঁচেক আগে"

“এখন তবে কোথায় আছিস ?”

“দুবাই, একটা ইংরিজি কাগজে”

“ও বাব্বা, সে তো খুব বড়লোকের জায়গা ! দারুণ ব্যাপার”

“আর শোন” একটু গম্ভীর হলেন মা, “সুধাদি আর ঘোষদার খবর পেয়েছিলাম সময়মত, রঞ্জুকে ফোন করেছিলাম”

“হ্যাঁ, দাদা বলেছে। তা তুমি এখানে কেন ?”

“এই দ্যাখনা, জোর করে নিয়ে এল আমায় ...চেক আপ করাবে, আমার কিচ্ছু হয়নি ... তোর কি হয়েছে ?”

“আমি একটু ভুগছি কয়েক মাস ধরে, বিশেষ কিছু নয়, এখন ঠিকই আছি, ডাক্তার বলেছে কয়েকটা টেস্ট করাতে” - একটু যেন ম্লান মনে হল পার্বতীদিকে।

“তুই একা ?”

“না” পাশে তাকাল পার্বতীদি, এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক, এতক্ষণ খেয়াল করিনি, সবিনয়ে মা’কে হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন। পার্বতীদি একটু ইশারা করল প্রণাম করতে, ভদ্রলোক বোধহয় খেয়াল করলেন না।

“আমার বর, সুনীল, সুনীল মিত্র” একটু হাসল পার্বতীদি।

“আর তোর ছেলে মেয়ে ?”

“একটিই মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেছে, ব্যাঙ্গালোরে থাকে। চার মাস আগে একটি নাতনি হয়েছে আমার” একগাল হাসল পার্বতীদি।

হঠাৎ মার ডাক পড়ল ভেতর থেকে।

“এই পার্বতী, চলি বুঝলি। তুই একদিন আয় না”

“দাঁড়াও মীরা মাসি তোমার ফোন নাম্বারটা দাও”

মোবাইলে ফোন নাম্বার নেওয়া হল। সুনীল বাবুও ওনাদের বাড়ির ফোন নম্বর দিলেন। আমি ডায়াল করে ওনাকে আমার নাম্বার দিলাম। পার্বতীদি মাকে আবার প্রণাম করে চলে গেল।

চেক-আপ আর টেস্টের পর বাড়ি ফেরা হল। কিন্তু মনটা চলে গেল সেই শিবতলায় বহু বছর আগে। আচ্ছা পার্বতী কি প্রবীরদার কথা ভাবে কখনও, কোন অলস দুপুরে ? প্রবীরদা তো বিরাট লোক এখন। নিশ্চয়ই অতীতের কথা ভাবার সময় নেই।

দারুণ ব্রিলিয়ান্ট ছিল প্রবীরদা। পড়াশোনায় দুর্দান্ত, বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট, আমরা তো শুনেছিলাম যে ক্লাসের সেকেন্ডবয় প্রবীরদার অনেক পেছনে থাকত। স্কুলের ডিবেটে সব সময় প্রথম। ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল সব ক'টাতেই চৌখশ। কিন্তু কোথাও একটা বিরাট গোলমাল ছিল। এত সব গুণ থাকা সত্বেও, আমাদের মা, বাবারা কখনও বলতেন না যে প্রবীরদার মত হও। বরং প্রবীরদার সঙ্গ এড়িয়ে চলতে বলা হত আমাদের। পাড়ার মধ্যে বুক ফুলিয়ে সিগারেট খেতে খেতে যেত প্রবীরদা, কারও তোয়াক্কা করত না। পাড়ায় মাঝে মাঝে ফিসফাস শোনা যেত প্রবীরদা নাকি মদ খায়। একদিন নাকি মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল, আর মজুমদার মেসো খুব মেরেছিলেন, পর্দার রড দিয়ে। আর প্রবীরদা সেই যে মার খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তিন দিন বাড়ি ফেরেনি। পরে মাসিমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কোথায় ছিলি বাবা ?" প্রবীরদা নাকি বলেছিল বন্ধুর বাড়ি।

পার্বতীদিরা থাকত আমাদের সামনের বাড়িতে। সুধামাসির সঙ্গে মার ভাব ছিল খুব। ঘোষজ্যাঠা আর বাবা ব্রিজ পার্টনার ছিলেন। প্রত্যেক শনি ও রবিবার দিন পাড়ায় বাবাদের তাসের আড্ডা বসত। এক এক দিন এক এক জনের বাড়ি। বেশ খাওয়া দাওয়া হত।

পার্বতীদিদের বাড়ি প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলা কীর্তন হত হারমনিয়াম বাজিয়ে। অপূর্ব গাইত পার্বতীদি। সুধামাসিও গাইতেন। মাঝে মাঝে রঞ্জুদাকেও গলা মেলাতে শুনতাম। বাড়ীর ভেতরে বেশ হৈ চৈ করে থাকত পার্বতীদি, বরং রঞ্জুদা একটু চুপচাপ ছিল। যতদূর মনে পড়ে, রঞ্জুদা আর প্রবীরদা

এক ক্লাসে পড়ত। কিন্তু খুব একটা ভাব ছিল না দু'জনের মধ্যে। আমি বেশ খানিকটা ছোটই ছিলাম, বিশেষ পাত্তা দিত না পাড়ার দাদা দিদিরা। পার্বতীদি কিন্তু আমার সঙ্গে গল্প করত খুব। আর জ্ঞান দিত। এর সঙ্গে মিশবি না ওর সঙ্গে খেলবি না। রাস্তায় বেরোলেই এক অদ্ভুত পরিবর্তন হত পার্বতীদির; মাথা নিচু করে হাঁটত, মনে হত বিষাদের প্রতিমূর্তি। রাস্তায় যেন দেখতেই পেত না, কিন্ত বাড়ি গেলে অন্য রকম। মা'র সঙ্গে গল্প করত খুব। রঞ্জুদা ছিল একটু চুপচাপ প্রকৃতির, দেখা হলে একটু হাসত, কথা বলত না।

প্রবীরদা ছিল খুব দরাজ হস্ত। পুজোর সময়ে বা যে কোনো অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা নিত। আমাদের ওপর হুকুম চালাত খুব। আমরাও ফাইফরমাস খাটতে পেয়ে ধন্য হয়ে যেতাম। মাঝে মাঝেই সিকিটা, টাকাটা বের করত পকেট থেকে, 'যা, ঘুগনি খেয়ে আয়' বা 'এই নে, জিলিপি কিনে নিয়ে আয়, সবাই মিলে খাব।' কোথা থেকে টাকা পয়সা পেত কে জানে ?

হঠাৎ একদিন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা শোনা গেল। পার্বতীদি নাকি প্রবীরদার সঙ্গে প্রেম করছে। ওদের নাকি চিঠি চালাচালি করতে দেখা গেছে। পার্বতীদি যখন স্কুলে যায় তখন নাকি প্রবীরদা রাস্তার উল্টো দিকে আস্তে আস্তে সাইকেল চালিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। পার্বতীদিকে স্কুলে পৌঁছে তারপর নিজে স্কুলে যায়। পাড়া জুড়ে ফিসফাস, শেষ পর্যন্ত প্রবীরের সঙ্গে? ছি ছি।

একদিন ওদের বাড়ি থেকে প্রচন্ড চেঁচামেচি শোনা গেল, রঞ্জুদাকে এত রাগতে দেখিনি কখনও। পার্বতীদি ছুটে পালিয়ে এল আমাদের বাড়ি, মাকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে মা আমাকে ইশারায় সরে যেতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে সুধা মাসি এলেন আমাদের বাড়ি। বাবা গেলেন ঘোষ জ্যাঠার কাছে। সেদিন খুব দেরি করে খাওয়া দাওয়া হল। শুতে গেলাম প্রায় মাঝরাতে।

তারপর থেকে সুধামাসি পার্বতীদিকে স্কুলে পৌঁছে দিতেন, এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা হল। সুধামাসি পৌঁছে দিতেন এবং নিয়েও আসতেন। প্রবীরদার চলাফেরায় বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ল না। আগের মতই বেপরোয়া; শিস দিতে দিতে সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে যেত, কোনও দিন পার্বতীদির বাড়ির দিকে তাকাতে পর্যন্ত দেখিনি।

কয়েক মাস পরে প্রবীরদা স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে শহর ছেড়ে কলকাতা চলে গেল। দারুণ রেজাল্ট, বোর্ডে সিক্সথ হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হল। মাঝে এক-আধবার ছুটিছাটাতে আসত, পরে আর দেখতাম না। শুনলাম বাড়ির সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখেনি। মজুমদারমেসোকে জিজ্ঞেস করলে উনি এড়িয়ে যেতেন।

রঞ্জুদা চলে গেল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। প্রায়ই আসত। বছর দুয়েক পর পার্বতীদিও স্কুলের পালা শেষ করে শহরেরই এক কলেজে ভর্তি হল। বি এ পাস করল, একদিন বিয়েও হয়ে গেল। বিয়েতে আমি ছিলাম না, ততদিনে আমিও কলেজে। পাশ করে বেরিয়ে আমি এক খবরের কাগজে ট্রেনি জার্নালিস্টের চাকরিতে ঢুকলাম। ততদিনে রঞ্জুদা সুধামাসি আর ঘোষজ্যাঠাকে নিজের কাছে নিয়ে গেল, নয়ডায়। প্রবীরদার পরিবার একদিন বাড়ি বিক্রি করে কোথায় চলে গেলেন। মা যোগাযোগ রেখেছিলেন কিছুদিন। কিন্তু আমার জীবন থেকে প্রবীরদা আর পার্বতীদি হারিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

একদিন আমিও প্রতিষ্ঠিত হলাম জীবনে। সংসার জীবনেও প্রবেশ করলাম একদিন, মা বাবাই খুঁজে দিলেন জীবনসঙ্গিনী, বাবারই এক বন্ধুর মেয়ে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলাম ধীরে ধীরে। বিখ্যাত বাংলা কাগজের সাংবাদিক, একটু আধটু পরিচিতিও হল সমাজে।

একদিন দেখা হয়ে গেল প্রবীরদার সঙ্গে। প্রবীরদা তখন এক বিরাট বহুজাতিক সংস্থার কর্ণধার। বম্বেতে থাকেন। মাঝে মাঝে আসেন কলকাতায়, পশ্চিম বাংলায় একটা বিরাট কারখানা তৈরি

করার প্রস্তাব চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করেন। গ্র্যান্ড হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মাঝে মধ্যে। এমনই এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা হল প্রবীরদার সঙ্গে।

গ্র্যান্ড হোটেলের বলরুমে বিরাট ভিড়। উদ্যোক্তারা জানালেন যে মিঃ মজুমদারকে একটু পরেই দিল্লি যেতে হবে। সাংবাদিকরা যেন প্রত্যেকে শুধু একটা করে প্রশ্ন করেন। ইংরিজি, বাংলা, হিন্দি কাগজের সাংবাদিক, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত। প্রথমে প্রবীরদা একটা নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিল, নিজের প্রতিষ্ঠানের "ভিশন" ব্যাখ্যা করল। কি চোস্ত ইংরিজি ! কে বলবে শিবতলা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে পাশ করেছে। যারা জানেনা তারা তো নিশ্চয়ই ভাববে বোধহয় বিলেতে মানুষ হয়েছে। হাতে পাইপ, পরনে হাল্কা রঙের স্যুট সঙ্গে ম্যাচিং শার্ট আর টাই। তারপর নানা রকম প্রশ্নের উত্তর দিল। কেউ বাংলায় প্রশ্ন করল, উত্তর এল ইংরিজিতে। আমি টেপ রেকর্ডার অন করে রাখলাম, কোনও প্রশ্ন করলাম না, সত্যি কথা বলতে কি বেশ একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল।

প্রেস কনফারেন্স শেষ হল, প্রবীরদা ডায়াস থেকে নামল। হঠাৎ মাথায় ভূত চাপল আমার। সামনে গিয়ে সবাইকে অবাক করে বেশ জোরে ডেকে উঠলাম, 'প্রবীরদা'...

একটু থমকে দাঁড়াল প্রবীরদা, ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে। দু-জন সফরি-স্যুট পরা স্বাস্থ্যবান লোক দু'পাশে এসে দাঁড়াল। আমি প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম, "চিনতে পারছ প্রবীরদা?"

হলশুদ্ধ লোকদের অবাক করে প্রবীরদা পাইপ ধরা হাত তুলে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল,
"গৌতম না ?"
"হ্যাঁ প্রবীরদা" উত্তেজনায় আমি তখন কাঁপছি।
"তুই এখানে কি করছিস ?" বলেই হাঁটা দিল প্রবীরদা গটগট করে, পেছন পেছন দুই সফরিস্যুট। আমিও ছুটলাম পেছনে।

"আমি তোমার প্রেস কনফারেন্স কভার করতে এসেছি প্রবীরদা"

"রিয়েলি, কোন চ্যানেল?"

"কোনও টিভি চ্যানেল নয়, খবরের কাগজ, ঐ..." কাগজের নাম বললাম।

"বাংলা কাগজ?" একটু যেন তাচ্ছিল্য প্রবীরদার গলায়। আমি ভ্রুক্ষেপ করলাম না,

"কিছু বল না প্রবীরদা, এ রাজ্যে কি শিল্পায়ন হবে?"

"ইউ মিন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ়েশন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ"

"ওয়েল, স্ট্রং পলিটিকাল উইল দরকার"

"আর?"

"কো-অপারেশন অফ অল"

"আর কিছু প্রবীর দা?"

"উই নিড আ মাচ বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার"

ততক্ষণে আমরা পৌঁছে গেছি হোটেলের বাইরে, একটা দুধ সাদা মার্সেডিস এসে দাঁড়াল, এক সফরিস্যুট ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল, গাড়ীতে উঠে গেল প্রবীরদা। একটু যেন হাত তুলল আমার দিকে, গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল, এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ধাক্কা মারল গাড়ির ভেতর থেকে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল মার্সেডিস। বোধহয় সোজা এয়ারপোর্ট।

সেখান থেকে সোজা অফিস পৌঁছলাম। রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলতে হবে। গিয়ে দেখি অফিসে বেশ হৈ চৈ পড়ে গেছে। জানাজানি হয়ে গেছে যে মজুমদার সাহেব গৌতম রায়ের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন এবং দুজনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। একটু মৃদু হেসে কপি লিখতে বসলাম।

পরের দিন ঐ তিনটে প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বেশ ফলাও করে এক বিশেষ সাক্ষাৎকার ছাপা হল। শ্রী মজুমদার পশ্চিম বাংলায় পরিকাঠামোর অভাবের কথা বলেছেন, এও বলেছেন যে শিল্পায়ন হতে গেলে একটা রাজনৈতিক সদিচ্ছার দরকার আছে রাজ্যে। শাসক এবং বিরোধী, দু-পক্ষেরই সহযোগিতা দরকার। বেশ আলোড়ন তুলেছিল সেই রিপোর্ট। সরকার পক্ষ থেকে কিছু প্রতিবাদ ছাপা হল কাগজে। খবরের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ হল। অন্য কিছু সংবাদ সংস্থা মজুমদার সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল, কিন্তু পারল না। প্রবীরদা তখন লন্ডনে।

রিপোর্টটা লিখে আমি খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু একটা গ্লানিবোধও কাজ করছিল। এতদিন পরে দেখা হল আর আমি ব্যক্তিগত কোনও কথাই জিজ্ঞেস করলাম না। মজুমদারমেসো, মাসি কেমন আছেন জিজ্ঞেস করা হল না। শুধু নিজের পেশাকেই গুরুত্ব দিলাম। আরও একটা প্রশ্ন জেগেছিল মনে। যদিও জানি সে প্রশ্ন করার সাহস আমার হত না। যদি জিজ্ঞেস করা যেত, "প্রবীরদা, পার্বতীদিকে কি মনে পড়ে কখনও, তোমার এই ব্যস্ত জীবনে?"

আর কখনও দেখা হয়নি প্রবীরদার সঙ্গে। পশ্চিম বাংলার সেই প্রকল্পও রূপায়িত হয়নি। নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। পরে হরিয়ানায় কারখানা তৈরি হয়। সেখানে রমরম করে চলছে। প্রবীরদার সংস্থার শেয়ারের দাম এখন আকাশছোঁয়া।

একদিন আমিও বিদেশ চলে গেলাম। খবর রাখতাম দেশের। প্রবীরদার খবরও টিভিতে, কাগজে দেখতাম। একদিন সংস্থার গ্লোবাল হেড অফিসে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হয়ে নিউ ইয়র্ক চলে গেল। দেশের প্রত্যেকটি কাগজে ফলাও করে বেরোল এক ভারতীয় নাগরিকের অভাবনীয় সাফল্য। সাময়িক পত্রিকাগুলোতে সাক্ষাৎকার বেরুল, সপরিবারে প্রবীরদা, পার্সি স্ত্রী ও দুই ছেলে। কি ঝকঝকে চেহারা সবার। টিভিতে ছেলেদেরও বক্তব্য শোনান হল। "উই আর ভেরি প্রাউড ওফ

আওয়ার ড্যাড” বলল রোহন মজুমদার, ছোট ছেলে রোশন মজুমদার একটু হাসল। প্রবীরদার স্ত্রী মেহের একজন সমাজসেবী, বললেন, “হি ইজ় জাস্ট ডুইং হিজ় জব”।

আমি দুবাই চলে গেলাম। একটু সচ্ছলতার মুখও দেখলাম। গলফ-গ্রিনে একটা তিন বেডরুমের ফ্ল্যাট কেনা হল। হৈ হৈ করে গৃহপ্রবেশ হল। মা, বাবাও এলেন, সঙ্গে ছিলেন ক'দিন। বছর কয়েক পর বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। স্ট্রোক হয়েছিল। মা খবর দিয়েছিলেন। আমরা এসে পৌঁছোনর আগেই সব শেষ। শিবতলার বাড়ি বন্ধ করে মা'কে নিয়ে এলাম কলকাতায় আমাদের ফ্ল্যাটে। চব্বিশ ঘন্টার লোক ঠিক করা হল, শিবতলা থেকেই নিয়ে আসা হল, চেনা। জীবন এগিয়ে চলল তার নিজের খেয়ালে।

আর এত দিন পর এই আবার দেখা হল পার্বতীদির সঙ্গে নিউ ক্যালকাটা ক্লিনিকে।

ছুটি শেষ হতে চলল। এবার কর্মস্থলে ফেরার পালা। একদিন সকালে এক কাপ চা নিয়ে বসেছি। গিন্নী ছেলেমেয়েদের নিয়ে পিতৃগৃহে। আমি সন্ধ্যেবেলা গিয়ে নিয়ে আসব। মা ঠাকুরঘরে। উপোস করে দু'ঘন্টা ধরে পুজো করেন। মা'র পুজো শেষ হলে একসঙ্গে একটু খাওয়া দাওয়া করা যাবে। মা'র রিপোর্ট পাওয়া গেছে। সব কিছু ঠিক আছে। শুধু একটু সুগার আছে। আপাততঃ ওষুধ না খেলেও চলবে। একটু খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর দিতে হবে, একটু হাঁটা চলারও দরকার। এসব উপদেশ মা খুব একটা মেনে চলবে বলে মনে হয় না। একটু চিন্তায় থাকব।

খবরের কাগজটা দিয়ে গেছে একটু আগে। সেই কাগজ, যেই কাগজে আমি কাজ করতাম একদিন। কাগজটা খুলেই চমকে উঠলাম। অদ্ভূত যোগাযোগ, প্রথম পাতাতেই বিরাট এক রঙিন ছবি প্রবীরদার। দিল্লিতে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কিছু একটা আলাপ আলোচনা করতে। তারই ফাঁকে এক তরুণ রিপোর্টার এক ঘন্টার সময় বের করেছে। নিশ্চয়ই নতুন কেউ, আমি চিনলাম না। কিন্তু খুব গুছিয়ে সব প্রশ্ন করেছে। আর খুব ধৈর্য্য ধরে সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে

প্রবীরদা। বিশ্বায়ন, উদার অর্থনীতি, ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ এমনকি পশ্চিম বাংলার সেই ভেস্তে যাওয়া প্রকল্প নিয়েও নিজের স্পষ্ট মতামত। বেশ লম্বা সাক্ষাৎকার, প্রথম পৃষ্ঠা থেকে তৃতীয় পৃষ্ঠায় গিয়ে শেষ হল। না, বেশ ভাল গুছিয়ে পেশ করা হয়েছে। প্রথম আর তৃতীয়, দু-পাতাতেই রঙিন ছবি প্রবীরদার।

পুরো পাতায় একবার চোখ বুলিয়ে আবার প্রথম পৃষ্ঠায় ফিরে যাব এমন সময়ে বাঁদিকে দ্বিতীয় পাতায় চোখ পড়তেই হাত পা অবশ হয়ে গেল। পার্বতীদির ছবি। চোখ আটকে গেল শিরোনামে। স্পষ্ট লেখা আছে "শোক সংবাদ"। মাথাটা ঘুরে গেল, ইচ্ছের বিরুদ্ধেই চোখ গেল নিচের লেখায়, "পার্বতী মিত্র, গত বুধবার ২১শে মে ... দীর্ঘ রোগ ভোগের পর সজ্ঞানে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন ... শোকাহত সুনীল (স্বামী), মঞ্জরী (কন্যা), অনিন্দ্য (জামাতা) ও তিন্নি (দৌহিত্রী) ... শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ... ফোন নং ... "। নিথর হয়ে বসে রইলাম।

মা'র পুজো বোধহয় শেষ হয়ে আসছে। আরতির ঘন্টা শোনা যাচ্ছে। মা'র কাছে খবরটা ভাঙতে হবে সাবধানে। ক'দিন ধরেই বলছে, "পার্বতীদের ফোন করে একদিন আসতে বল। অনেক কথা আছে"। ফোনটা আর করা হয়নি; নিজেকে বিরাট অপরাধী মনে হল।

আশ্চর্য! বহু বছর পর আবার একসঙ্গে হল পার্বতীদি আর প্রবীরদা। একই দিনে, একই খবরের কাগজে; মুখোমুখি।

বদান্যতা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

১.

হাজিরার খাতাটা আর একটু হলেই চলে যেত। আর বরবাদ হয়ে যেত মাসে তিনবারের বেশি দশ মিনিটের ওপর দেরিতে আসার জন্যে পুরো একদিনের বরাদ্দ ছুটি। যানজটের জন্যে প্রতিদিনই তো আতঙ্কে আতঙ্কে দিন কাটে। ঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়া যাবে কিনা। অথচ একবার হাজিরা দেওয়ার পর কি ঘটছে, তা নিয়ে কেউই আর বিশেষ মাথা ঘামায় না।

টেবিলে তোমার নথিপত্রগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখো। জ্যাকেটটা খুলে চেয়ারে ঝুলিয়ে দাও। পরে এমন ভাব দেখাও, যেন তুমি না থাকলেও আছ। এই হয়তো হবে রকমের প্রাকৃতিক কাজের চাপের তাগিদেই লোকের সুদীর্ঘ সারির পেছনে দাঁড়িয়ে উসখুস করছ। কিংবা কোন জরুরি কাজের সুবাদে অফিসেরই অন্য কোন বিভাগে যাবার প্রয়োজন হয়েছে। সহকর্মীদের অবশ্য সঠিক জানিয়ে রাখা চাই, কোথায় গেলে তোমার হদিশ মিলবে। তাহলেই সব রক্ষে। কেউ যদি তোমার পেছনে না লাগে, ভয়ের কোন কারণ নেই। এ ব্যাপারে তুমি তো আর একা নও। যতদিন তোমার মাথার ওপরে যাঁরা ছোট, বড় কিংবা মাঝারি বড়বাবু, সবাই একই দুর্বলতায় ভুগবে, ততদিন তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কাকে কাকের মাংস ঠোকরায় না।

এ কোনও যে সে অফিস নয়। একেবারে জলজ্যান্ত সরকারি অফিস। কয়েক হাজার বছরের অভিজ্ঞতা এর মজ্জায় মজ্জায়। কত মন্ত্রী এলো। কত আমলা বদল হল। কত আইন ওলটপালট হল। কিন্তু এই অফিসের ভোল কেউ কেউ পাল্টাবার অভিপ্রায় নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েও নাজেহাল হয়ে বিদেয় নিল। এবং অকৃতকার্যতার বোঝাটা রীতি অনুযায়ী সুকৌশলে আগামী দিনের লোকেদের কাঁধে চাপিয়ে দিল। অতীতকে দোষারোপ করে যে বর্তমান, সেই বর্তমানও রেহাই

পাবে না একদিন ভবিষ্যতের হাত থেকে। এই ভাবেই চলে আসছে, এই ভাবেই চলবে। ভদ্রলোকের এক কথা। সাফ কথা।

এ অফিসে ঢুকবো বললেই ঢোকা যায় না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এর ওর মুখঝামটা খেয়ে এই যে এত সব ডিগ্রি-ফিগ্রী জোগাড় করলে, ওসব সবই ফালতু। আসল কথাটা কিন্তু মামা-কাকা। আর এইসব মামা-কাকাদের দৌলতে একবার যদি কোনক্রমে ঢুকে পড়তে পার, ব্যস, এ জীবনের মত নিশ্চিন্তি। নিজে থেকে ইস্তফা না দিলে, রেহাই নেই তোমার সেই অবসর পাওয়ার আগের দিন অবধি। আর অবসর পেয়েও মৃত্যু পর্যন্ত তোমার কত কাজ। এই তো সবে শুরু হল অন্যদের কাছে নিজেকে নতুন করে জাহির করার পালা, জীবনে তুমি কত কি না করেছ, অতীতের সব কাজকর্মই একটা মিছরির আচ্ছাদনে মোড়া, কোথাও কোন ঝাল নেই, টক নেই, তেতোও বাদ, শুধু চিনির স্বাদ। ফিরিস্তির আর যেন কোনো অন্ত নেই।

এই রকম মামা-কাকার দৌলতেই এটা অমলের দুনম্বর চাকরি। না, ভুল বুঝবেন না। দুনম্বর বললে কেউ হয়ত ভুয়ো কিংবা মেকি অর্থে ভেবে নেবেন। তাই শুধরে নিতে হচ্ছে। এটা অমলের দ্বিতীয় চাকরি।

প্রথম চাকরিটা যেন হাতেখড়ি। স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফল বেরতে তখনও মাস তিনেক বাকি, তাই অমল ভেবেই পাচ্ছিল না কি করবে। অমলের মায়ের কাছে অমলের ব্যাপারে নানান প্রস্তাব আসে। এই কুঁড়ে ছেলেটাকে দিয়ে কিৎসু হবে না। শুধু বসে বসে খাবে, আর দিনরাত নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে। নয়ত খারাপ সংস্রবে পড়ে একেবারে গোল্লায় যাবে, মাগিবাজি, দাদাগিরি আর মস্তানি করে বেড়াবে। এক কাকা এসে বললেন, আমার কাছে আসুক অমল, আমার কারখানায় ঢুকে হাতের কাজ শিখে মানুষ হোক। আরও লেখাপড়া শেখানো মানে পয়সা জলাঞ্জলি দেওয়া। গতর নড়িয়ে বুঝে দেখুক সংসার চালানো কেমন কঠিন কাজ, বিশেষ করে নিজের রোজগারে। কেউ

বললে, একটা মালদার ঘর দেখে ওকে ঘরজামাই করে দাও, এই বোঝা তাহলে নেমে যাবে নিজের ঘাড় থেকে। এই আকালের দিনে ওকে তোমায় বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হবে না। পরের ঘরে গিয়ে ওর কি দশা হবে তা জেনেও কোন দরকার নেই। ভগবান প্রাণ দিয়েছেন, ভগবানই আহার জোটাবেন। যেমন সব জীবেরই জোটে।

অমলকে কাজে ঢোকানোর ভার পড়ল অমলের মামার এক গলায় গলায় বন্ধুর ওপর। মামার সঙ্গে একসঙ্গে কোন এক সময় এক অফিসে কাজ করতেন। মিলিটারি অডিট অফিসের অফিসার। সবে অবসর গ্রহণ করেছেন। মামা তাঁকে অনুরোধ করলেন অমলের জন্যে একটা চাকরি খুঁজে দিতে। বললেন, তুই তো সবে রিটায়ার করেছিস, তোর সঙ্গে মিলিটারি অফিসের যোগযোগটা এখনও সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায় নি, অমলের জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দে না। তাহলে রানির সংসারেরও কিছুটা সুরাহা হয়।

তারপর মাস খানেক কেটে গেল। কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করে না। এক চেনাজানা কাকার কাছে গিয়ে চাকরির প্রস্তাব পাড়তেই শুরু হয়ে গেলো উপদেশ বর্ষণ। হ্যালো, তোমার মত এমন ব্রাইট ইয়ংম্যান কেরানির চাকরিতে ঢুকে কি করবে? তোমার চোখেমুখে কত জিজ্ঞাসা। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এমন কি উকিল হলেও দেশের কত সেবা করতে পারবে। আর হ্যাঁ, ঘরকুনো হলে কিছুই হবে না। বেরিয়ে পড়, ইয়ংম্যান, বেরিয়ে পড় বাইরের জগতে। এই আমাকে দেখো, আমি ডাক্তারি পাশ করে, সুযোগ পেয়েছিলুম বিদেশে যেতে। এক মুহূর্তও দ্বিধা করিনি। কোরিয়ার যুদ্ধে চলে গিয়েছিলুম। হাজার হাজার ক্ষতবিক্ষত আহত সৈন্যদের সেবায় মেতেছিলুম। যেমন ঝুঁকি তেমন আয়। চলে যাও, তোমার চাউনিই বলছে, তুমি কখনও পরাজয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে না। কে পারবে তোমাকে আটকাতে? নানা উপদেশ শোনার পর অমল খাবার জন্যে পেয়েছিল এক গেলাস বিশুদ্ধ কলের জল। কেন? তার ফিরিস্তিও শুনতে হয়েছিল অমলকে বাধ্য হয়ে। মিষ্টি খাবারটাবার কিছুই দেওয়া গেল না, ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা আজই ছুটিতে বেড়াতে

বেরোচ্ছি, তাই ঘরে কিছু মজুত নেই। সামনের বারে চাকরি পাওয়ার খবর নিয়ে যেদিন আসবে, সেদিন পেট পুরে খেয়ে যেও কিন্তু, কেমন?

মনোহরপুকুর রোডের সেই কাকাত্মীয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অমল ভাবে, পারলে এখানকার পুকুরটাতেই ডুবে মরতে পারলে সব ভাবনা চুকে যেত। কিন্তু সেখানে অনেক চেষ্টা করে কোন পুকুরই সে খুঁজে পেল না। এই ধরণের কত কাকা, কত মামার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে অমলের। সেই সব মামা-কাকাদের একটা নতুন শব্দের মোড়কে মুড়ে দিয়েছে সে। আখ্যা দিয়েছে তাদের কাকাত্মীয়, মামাত্মীয় বলে।

মামার বন্ধু সেই মামাত্মীয় সত্যি সত্যিই একদিন তলব দিলেন। কাল তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব মিলিটারি অফিসে। হয়তো একটা কাজের জোগাড় হয়ে যাবে। স্টেনো, টাইপিস্টের কাজ জানলে কাজের অভাব? অমলের সমস্যা হল পোশাক নিয়ে। হাতে এমন সময় বা পয়সা কিছুই ছিল না যে, নতুন পোশাক কিনবে চাকরির ইন্টারভিউ দেবার জন্যে।

মা ফন্দি বাতলে দেন, যা না অমল তোর এক ক্লাসের বন্ধু হরিহরের কাছে। ওর কাছে নিশ্চয়ই ফুলপ্যান্ট আছে। সবুজ রঙের নাইলনের ফুলপ্যান্ট পরে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল অমল। অমল গাঁয়ের ছেলে, মিলিটারিফিলিটারির ফ ও জানত না। উচ্চপদের এক পাঞ্জাবি মিলিটারি অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি যে সে কাজ। মামাত্মীয় আগেই ট্রামে করে আসবার সময় একটু ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছিলেন। লাস্ট মিনিট উপদেশ। কিভাবে ঘরে ঢুকতে হয়, কিভাবে অভিবাদন জানাতে হয়, কিভাবে বিদায় নিতে হয়, কিভাবে শেকহ্যান্ড করতে হয়। মিলিটারিতে ওই বাঙালি নমস্কারফমস্কারের ঢং অচল। মামাত্মীয় কি কি করবেন, তা আগে থেকে ভাল করে বুঝিয়েসুঝিয়ে দিলেন। তিনি আগে কম্যান্ডারের ঘরে যাবেন, তারপর অমলের ডাক পড়লে অমল কি ধরণের আচরণ করবে, সবই বুঝিয়ে দিলেন। কম্যান্ডার কয়েকটি প্রশ্ন করেন। কোন জ্ঞানের

প্রশ্ন নয়। ইংরিজি স্কুলের বিদ্যে হলেও মানে বুঝতে কষ্ট হল না। ও বুঝল, কম্যান্ডার জানতে চাইলেন, অমলের ঘরে কে কে আছেন? সে চাকরিটা পেলে কি করবে? সব টাকা মায়ের হাতে তুলে দেবে কিনা? চাকরিটা পেয়ে গেল অমল। কেরানির কাজকর্ম করতে হলেও মাইনে পেল মালীর। কারণটাও মামাত্মীয় অমলকে বুঝিয়ে বললেন। একটা মালীর পদ খালি ছিল বলেই সেই পদে ঢুকিয়ে দেওয়া গেল। তবে কম্যান্ডার বলেছেন, তোকে মালীর কাজ কিছুই করতে হবে না। তুই লেখা পড়া জানা বুদ্ধিমান ছেলে, তোকে দিয়ে লেখাজোখার কাজই করাবেন ওরা। মাইনেটা অবশ্য আপাতত সবার চেয়েও কম। তাতে কি আছে? পরে কোনও পোস্ট খালি হলে তুই প্রোমোশন পেয়ে যাবি কেরানির পদে। কিংবা হয়তো মিলিটারিতেই ঢুকে পড়বি কোনও উচ্চপদে। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখ্ অমল, রানির ছেলে তুই, রাজপুত্র তুই, তুই অনেক বড় হবি, এটাই তো তোর ভাগ্যে লেখা।

কাজ করার এক সপ্তাহ বাদে, অমল দেখল, সেই মামাত্মীয়ের অমলের বয়সী মেজমেয়েও সেই মিলিটারি অফিসে কাজে ঢুকেছে। মালীর পদে নয়। রীতিমত কেরানির পদে। মাইনে অমলের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। কাজ দুজনের একই হলেও। দুবছর বাদে, অমলের সেই মামাত্মীয়ের মেজমেয়ের এক ব্যাঙ্ককর্মচারীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার পরেও, অমল সেই মালীর পদেই ন্যস্ত রয়ে গেল। কোন পদোন্নতি হল না অমলের।

বর্তমানের এই চাকরিটাও জুটেছিল অন্য আরেক মামাত্মীয়ের দৌলতে। সেই মামাত্মীয় কিন্তু অমলের সঙ্গে নিজের ছেলেকেও কাজে ঢোকালেও, একই পদে ঢুকিয়েছিলেন। এই অফিসটা মিলিটারির একাংশ হলেও একেবারে খোদ মিলিটারি অফিস ছিল না। এই অফিসের আওতায় কোন বাগানটাগান ছিল না বলে হয়তো মালীর পদে ঢুকে অমলকে সেখানে কেরানির কাজ করতে হয়নি। এটা ছিল মিলিটারির অস্ত্র তৈরির কারখানার অডিট অফিস। এই মামাত্মীয় অমলের

বড়মামারই অধীনে একসময় কাজ পেয়েছিলেন বলেই বোধহয় তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধটাও আগের অন্য মামাত্মীয়ের চেয়ে একটু অন্যরকম ছিল।

২.

হাজিরা দিয়ে নিজের টেবিলের কাছে যেতেই অমলের ডাক পড়ল বড়সায়েবের ঘরে। দেরি হয়নি, তবু কেন ডাকলেন, ভেবে কূল পায়না অমল। সুদের হার কষে যে হিসেবগুলো গতকাল জমা দিয়েছিল, তাতে কোন ভুলভাল থেকে গেছে হয়ত। সচরাচর বড়সায়েব অমলের কাজে ভুলভাল থাকে না বলে চোখ বুজে সই করে দেন। জমা দেবার আগে নিজে তো দেখেই, নরেনদাকে দিয়েও একবার পরখ করিয়ে নেয় অমল। তাতেও যে ভুলচুক হতে পারে না এমন নয়। মানুষ মাত্রেই ভুল হতে পারে।

বড়সায়েবের ঘরের দরজা খোলাই ছিল। অমলকে দরজার বাইরে দেখে টেলিফোনরত বড়সায়েব ইশারায় অমলকে ভেতরে আসতে বলেন। অমল ভেতরে যায়। অপেক্ষা করে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। কথোপকথন শেষ হতে অমল বলে, নমস্কার স্যার, আমায় আসতে বলেছেন?

বড়সায়েব অমলকে বসতে ইঙ্গিত করে বলেন, হ্যাঁ, আপনার জন্যে তিনটে খবর আছে। দুটো ভালো খবর আর একটা মন্দ। কোনটা আগে শুনবেন?

- আপনিই ঠিক করুন স্যার, কোনটা আগে বলবেন।

- তাহলে মন্দটাই আগে বলি। আপনার ছুটির আবেদনটা মঞ্জুর করা যাচ্ছে না। কারণ আপনার বাড়তি কোন ছুটিই নেই। এ বছরের প্রাপ্য ছুটি আগেই শেষ হয়ে গেছে।

- একদিনও বাকি নেই ? তেত্রিশ দিন ছুটি পাওনা ছিল, সব নিয়ে নিয়েছি ?

- খাতায় তাই তো দেখছি। নিয়মমতো সব শেষ। তবে একান্ত ছুটির দরকার হলে অন্য উপায়ও আছে।

- কি স্যার ?

- কিসের জন্যে ছুটি নেবেন, জানলে অবশ্য নিয়মভঙ্গ করে দু'এক দিনের জন্যে বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়।

- না, স্যার, দু'এক দিনের ছুটি চাইছি না। নিলে কয়েক সপ্তাহ নিতাম। নেই যখন কি আর করা যাবে ?

- অর্ধেক কিংবা বিনাবেতনে ছুটি নিতে কোন বাধা নেই। কোন অসুখবিসুখ করলে অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা। কোন সীমা নিষেধ নেই, যত পারেন নিতে পারবেন। আর যক্ষ্মা হলে পাঁচ বছর অবধি নিতে পারেন ছুটি, কোন বাধা নেই। তা আপনার যক্ষ্মাটক্ষ্মা কিছু হয়নি তো? দেখে তো সেরকম মনে হচ্ছে না কিছু। ডাক্তার আর হাসপাতালের অনুমোদন নিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। কঠিন কোন ব্যাধিতে ভুগলেও যে অফিসে আসতে হবে সেকথা তো আপনাকে কেউ কোনদিন বলেনি। আর ছোঁয়াচে কোনো রোগ হলে তো কথাই নেই। আপনি তখন ছুটি নিতে বাধ্য, থাকুক বা না থাকুক।

- না, স্যার, এই একনাগাড়ে কাজ করে একটু পরিশ্রান্ত। তাই ভেবেছিলুম একটু ছুটি পেলে...

অমলের হঠাৎই মনে পড়ে যায় তার বন্ধু হরিহরের কথা। যার ফুলপ্যান্ট পরে অমল প্রথম চাকরিটা পেয়েছিল, মালীর বয়ানে কেরানির কাজ। সেই হরিহর যক্ষ্মায় ভুগছে অনেকদিন ধরে। ওর ছুটিফুটি নেওয়ার কোন ঝামেলাই নেই। চাকরিবাকরিই করেনি কোনোদিন। রোগের জন্যেই পায়নি কোনো চাকরি। মামাত্মীয়, কাকাত্মীয়ের কোন অভাব না থাকলেও।

- এইবার শুনুন ভালো খবরটা। এইমাত্র নোটিস এসেছে, আপনার চাকরিটা পাকা হয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরের পদে অস্থায়ীভাবে উন্নতি হয়েছে। আর দ্বিতীয় ভালো খবরটা হচ্ছে, যদি আপনি বিদেশে বদলি হতে রাজি হন, তাহলে এই মুহূর্তেই এই অস্থায়ী পদটাও স্থায়ী হয়ে যাবে। আর অফিসের পরীক্ষায় বসতে কোন অন্তরায় থাকবে না। পাশ করলেই হয়ে যাবেন গেজেটেড অফিসার। নিজেই তখন সব কিছু নথিপত্র অ্যাটেস্ট করতে পারবেন। কনগ্রাচুলেশন। হাই ফাইভ। আমিও আপনার কাজে বেশ খুশি, তাই সুপারিশ করেছিলাম ওপরে। এখন ভাবুন কি করবেন। আপনার মত কর্মী হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে জেনেও আপনার পদোন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না।

- থ্যাঙ্ক য়্যু, স্যার।

৩.

- বোসো, বাবা, বোসো। সেই ক'বছর আগে একবার এসেছিলে। চাকরি পেয়ে তো একেবারেই ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ।

- হরে কেমন আছে, মাসিমা ? জিজ্ঞেস করে অমল।

- ভাল নেই। বেশ বাড়াবাড়ি যাচ্ছে কয়েকদিন ধরে। কাশির দমকে প্রাণান্ত। ঘরে দরজা, জানালা বন্ধ করে শুয়ে থাকে সারাদিন। মাঝে মাঝে কি সব অলক্ষুণে কথা বলে। বলে, কড়িকাঠে ঝুলব, তারও সামর্থ্য নেই। কত আশা ছিল আমার, অন্যদের মত আমার হরেও চাকরিবাকরি করবে। বে থা করে ঘরসংসারী হবে। যে রোগে পেয়েছে ওকে, সে আশা আমার আর পূর্ণ হবার নয়।

মাসিমার কথাগুলো শুনে অমল নিজেকে কেমন যেন দোষী মনে করে। স্কুলে থাকার সময় এই হরিহরই তাকে নানা বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করত। অঙ্কে বিশেষ মেধাবী বলে ক্লাসের পরে

সবাইকে মাস্টারমশাইদের চেয়েও জলের মত সরল করে বুঝিয়ে দিত। অমল আর হরিহর, দুজনে যেন হরিহর আত্মা। অমল খেলায় ভালো আর হরিহর পড়াশোনায়। তাই দুজনের মিলটাও ছিল যেন এই বৈপরীত্যের জন্যেই তত জমজমাট।

অমল বলে – "কাজের চাপে এতদিন আসতে না পারলেও হরের কথা সব সময় ভেবেছি, মাসিমা। তাছাড়া অ্যাদ্দিন হরের জন্যেই চেষ্টা চরিত্র করেছি, ওকে কোন একটা নামকরা স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি করে দেওয়া যায় কিনা। চিকিৎসা আর জলহাওয়ার গুণে ও আবার ভালো হয়ে উঠবে, মাসিমা।"

- কিন্তু বাবা, অমল, আমার কি আর সে সঙ্গতি আছে যে, হরেকে এত পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করাব? আমি একা বিধবা মানুষ। দুবেলা খোরাক যোগাতেই...

- ওসব খরচপাতির কথা আপনি চিন্তা করবেন না। সে দায় আমার।

হরিহরের মায়ের চোখে জল এসে যায়। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, এই না হলে বন্ধু! বড় আকাল, বাবা, বন্ধুর আজকাল বড় অভাব।

- আপনি হরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস দিয়ে ব্যাগ তৈরি করে রাখুন, হরেকে বাইরে যাওয়ার জামাকাপড় পরিয়ে দিন। আমি আজই ওকে রাঁচির বিখ্যাত স্যানাটোরিয়ামে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দেব।

৪.

হরিহরকে নিজের নামে ভর্তি করিয়ে অমল অফিসে কাগজপত্র পাঠিয়ে দিল। হাসপাতালের খরচ বহনের জন্যে হাসপাতালকেই অনুরোধ করলে তার অফিসে সরাসরি বিল পাঠিয়ে দিতে। তারপর

নিজের মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তীর্থভ্রমণে। হরিদ্বার থেকে কন্যাকুমারী। কোন তীর্থস্থানই বাদ পড়ল না।

মাস দুয়েক বাদে ফিরে এসে অমল হরিহরকে স্যানাটোরিয়াম থেকে ফিরিয়ে আনতে গেল। সেখান থেকে ছাড়পত্র না পেলে অফিসে যোগ দেওয়া যাবে না। সুস্থ হরিহরকে আবার ফিরে পেয়ে মাসিমাও কি যে আনন্দ পাবেন, সেকথা ভেবে অমলের মনেও কেমন যেন সুখ জেগে ওঠে।

হাসপাতালে গিয়ে অমল তার বন্ধু হরিহরের খবর নেয়। রিসেপশনের মহিলা কর্মচারী অমলের দিকে বেশ করুণ চোখে তাকিয়ে বলেন, আপনার বন্ধু, অমলবাবু, অফিস থেকে প্রায়ই গাদাগাদা চিঠি আর ফুলের তোড়া পান। আরোগ্যের শুভকামনা জানিয়ে চিঠি। প্রথম প্রথম নিতে চাইতেন না কিছুতেই। বলতেন, অমলের চিঠি আমি পড়ব কেন ? নিজেকে ভাবতেন, উনি নাকি অমলই নন। ডাক্তারবাবুদের মতে, রোগের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্যেই নাকি এইসব কঠিন রুগীদের স্থান, কাল ও পাত্রজ্ঞান হারিয়ে যায়। অফিস থেকে একদল লোকও এসেছিলেন একবার দেখা করতে, কিন্তু সেদিন বাড়াবাড়ি হওয়াতে আমরা দেখা করতে দিইনি।

অফিসের লোক এসে দেখা করতে পারেনি শুনে অমল আশ্বস্ত বোধ করে। আসল ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে কেলেঙ্কারির সীমা থাকত না। কর্মচারিণীকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়েও থেমে গিয়ে অমল জানতে চায়, কোথায় তার বন্ধু ? কোন ঘরে আছে ?

কর্মচারিণী উত্তর দিলেন, নেই ।

- বেড়াতে বেরিয়েছে বুঝি ? এই ঠাণ্ডায় কোথায় গেছে ?

- না, না । বেড়াতে নয়, আমি খুবই দুঃখিত, স্যার, আপনার বন্ধুর জন্যে। গত পরশু রাতে উনি চলে গেলেন। একদম হঠাৎ করে। অবস্থা কিন্তু ভালর দিকেই যাচ্ছিল, তবু... সরি, স্যার। কাগজপত্র সব তৈরি করাই আছে। চান তো, আজই আপনি আপনার বন্ধুকে নিয়ে যেতে পারেন।

জলের ক্যালিডো দর্পণে

অভিমন্যু

ধূপছায়া রোদের নরম আলোর ভিতরে
কোমল জলের নিচে
শৈবালের বিছানায় শুয়ে আছি,
জলতরঙ্গে কানে ভাসে মাছের আহ্বান -
আয় কাছে আয় !
রুদ্র বৈশাখের দুপুরের দাবদাহে
শুকনো পাতার ঘূর্ণি থেকে
পালানোর প্রাণান্ত প্রয়াস,
শ্রাবণীর বিষাক্ত ছোবল মুছে দিতে চেয়ে
ওষ্ঠাধরে চন্দনের প্রলেপ লাগানো -
এইসব বহুবিধ অলৌকিক ক্রিয়া শেষ ক'রে,
হাতের মুঠোয় ধরা
রক্তজবার মতো হৃদয়কে ছুঁড়ে ফেলে,
ধূপছায়া রোদের নরম আলোয়
এখন শুয়েছি এসে শৈবালের নিচে
কোমল জলের বিছানায় ।

এইখানে জলের ক্যালিডো দর্পণে
রঙিন মাছের প্রতিবিম্বগুলি
বারবার ভেঙে যায়,

ভাঙে, গড়ে, রং বদলায় -
প্রতিবিম্ব থেকে জলের পরতে
ব্যাপ্ত হতে থাকে
রমণীয় আতরের ঘ্রাণ ....
ম্রিয়মান ধূপছায়া রোদ
কখন হারিয়ে যায় !

জলের মর্মরে ক্রমে জেগে ওঠে নীল -
আদিম বিষের ঢেউ,
ওষ্ঠাধরে দাবদাহ !
আহা, ক্যালিডো দর্পণে ঘোরে ছবি -
হৃদয়ের রক্তজবা খুবলে ছিঁড়ে খায়
লক্ষ কোটি নীল মাছ,
ল্যাজের ঝাপটে তোলে ঝড়
শৈবালের বিছানায়,
জলতরঙ্গে অসুরের নাদ -
যা-ও, তফাৎ যাও, এক্ষুনি !

রিপ্লেসমেন্ট

নবকলম

শোন অদিতি,

নাছোড় আবদারের আগে ক'টা অভিযোগের কথা বলি।

জীবনে অতিথি হয়েই আমার দু' দুটো পুরনো সঙ্গী কে

অ্যামপিউটেট করে বাদ দিয়েছ।

আমার ঠোঁটের কোণে মানায় না এবং সীমাহীন ক্ষতি করে –

এই অজুহাতে সিগারেট;

ঠোঁটের মাঝের দিকে মানায় না, চোখের তলায় ঠুলি পড়ে –

অতঃপর দি এন্ড টু শিভাস রেগাল টু!

যুবক ঠোঁটে স্পর্শের যে এই শূন্যতা,

তা পূরণ প্রায় অসম্ভব -

এ কথা জেনে ও মেনে নিয়েও রিপ্লেসমেনটের কথা ভাবতে বসে

মনে পড়লো – তোমার অমন চমৎকার ঠোঁট।

আমার কথায় পাত্তা দিও না তেমন, বায়াসড হয়ো না মোটেই।

তুমি নিজের মতো করে, আরও যত্নে এ অভাব

ঢেকে দেওয়ার কথা ভেবো।।

গরম ও আনুষঙ্গিক

ডাঃ অশোক দেব

১.

কলকাতায় নাকি এমন গরম পড়েছিল যে আমার এক বন্ধু স্টেটাস দিলো — 'গরমে হারিকিরি করতে ইচ্ছে করছে।' গরম যে বেধড়ক পড়েছে সেটা বোঝা গেল যে হারাকিরি-হারিকিরি হয়ে ওঠাতে। শুধু তাইই নয় — অনেকেরই মাথার নাড়িভুঁড়িগুলো কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে উঠছে আর পেটের ঘিলুগুলোকে টেনে টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। মনে পড়ছে মে-জুনের দিনগুলো। কলেজ থেকে ফিরে স্নান সেরে ভেজা তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে টেবলফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে ঘুম এসে যেত। জানালা খোলা রাখলে গরম হলকা ঢুকতো ঘরে। গায়ের তোয়ালে গায়েই শুকিয়ে যেত (তখনও অবশ্য শান 'জবসে তেরে ন্যায়না' গেয়ে ওঠেনি)। তখন রাস্তার গলা পিচে আটকে যাওয়া হাওয়াই চটি দেখে অবাক লাগত। দুপুরে জনমানবশূন্য রাস্তায় একটা কুকুরেরও দেখা পাওয়া যেত না। তখনও বাড়িতে এসি লাগেনি। কাঁচা আমের শরবৎ, বেলের শরবৎ-লস্যি — দই এসব খুব চলত।

যখন লেখাটি লিখছি তখন আমি কুয়েতে বসে। এখানে এখনই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি। আর কিছুদিনের মধ্যেই চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন ছুঁয়ে ফেলবে। কিন্তু এখানে সেন্ট্রালি এসি ফ্ল্যাট, ক্লিনিক, দোকানপাট, মল, গাড়িতে এসি। সাধারণত গাড়ি ছাড়া দুপুরে রাস্তায় মানুষ থাকে না। কলকাতায় যখন গরমের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে হিউমিডিটি, বাতাসে জলীয় বাষ্পের মাত্রা থাকে ষাট থেকে নব্বই শতাংশ তখন এই সময় এখানে হিউমিডিটি মাত্র আট থেকে বারো শতাংশ। তাই রাস্তায় বের হলে গায়ের চামড়া জ্বালা করলেও ঘাম প্রায় হয়না বললেই চলে। কলকাতায় থাকতে বেশিক্ষণ এসি চালাতে ভয় হত পাছে সিইএসসি একটা ডাইনোসরের মতো বিল না ধরিয়ে দেয়। আর কুয়েতে সপ্তাহে সাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা এসি সহ সব কিছু চলছে। লোডশেডিংয়ের ভয় নেই। এমনকি সরকারি নির্দেশ দেওয়া আছে যে মাস দুয়েকের ছুটিতে বাইরে গেলেও ঘরের এসি বন্ধ করা চলবে না। কলকাতায় থাকতে ডাক্তারি প্র্যাকটিসের সুবাদে বেশ কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রতিনিধি

অর্থাৎ মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল, এখনও হয়ে চলেছে তবে দেশান্তরে আর তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মিশরীয়, ফিলিস্তিনি কিম্বা লেবানিজ, তাদের সাথে আর যাই হোক খোশগল্প করা চলে না। কলকাতায় থাকতে প্রত্যেকের মধ্যে আমি আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। তাদের সাথে সময় সুযোগ হলেই গল্পসল্প হত।

কেউ বা কার্ড পাঠিয়ে শান্ত হয়ে বসত। কেউ বা বাইরে বসে মোবাইল ফোনে জানান দিত —স্যার, আমি এসে গেছি, বাইরে অপেক্ষা করছি। কেউ বা মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করেই অধৈর্যভাবে দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে নিজের মুখটা দেখানোর চেষ্টা করত। কেউ এসে শুধু স্যাম্পেল সহ উপঢৌকন সাজিয়ে দিত, কেউবা খুব সিরিয়াসলি ভিস্যুয়ালেট খুলে প্রোডাক্টের ফর্মুলা থেকে কার্যকারিতা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে যেত। এমনভাবেই হঠাৎ একদিন এক রসিকের সাথে আলাপ হল। সেই রসিক চূড়ামণির দৌলতে অনেক জ্ঞানলাভ হল। এখন সেই কোম্পানির নামও মনে নেই — এমনকি তার নামটিও হারিয়ে গেছে। কিন্তু তার অভিজ্ঞতার বিবরণগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে আছে।

২.

একদিন এমনই এক সাংঘাতিক গরমের দুপুরে ঘেমে নেয়ে বেচারি হাজির হল আমার চেম্বারে। খানিকক্ষণ বসে ঠান্ডা হবার পরে দু-চারটে স্যাম্পেল আমার টেবিলে রাখার পরে খুব বিতৃষ্ণ মুখে বলল — নাহ্ ডাক্তারবাবু আর এ লাইনে পারছি না। এর চে নটা পাঁচটা কেরানির চাকরি অনেক ভাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম — কেন? কি আবার হলো!!

- কি আবার হবে। ঠান্ডায় তো বসে আছেন স্যার বুঝবেন কি করে! আমরা কুকুরের চে অধম।
- ধ্যাৎ, এমন কথা বলে নাকি!
- জানেন না তো, লোকে আমাদের নিয়ে কি গল্প বলে।

- সেটা কি?

- এই রকম গরমের দুপুরে কুত্তাও বেরোয় না রাস্তায়, দূর থেকে রাস্তায় যদি কখনও মনে হয় যে একটা পাগলা কুকুর আসছে — তাহলে নৈব নৈব চ। নির্ঘাৎ জানবেন ওটা কোন পাগলা কুকুর নয়, আমাদেরই স্পিসিজের কেউ আসছে। আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো হাতে একটা ভারী ব্যাগ।

জল-টল খেয়ে ওর মাথাটা খানিকটা ঠান্ডা হবার পরে আমি আবার জানতে চাইলাম - কি ব্যাপার বলুন তো? বেশ কিছুদিন আপনাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, ছুটি নিয়েছিলেন বুঝি?

- আর ছুটি, সে কি আর আমাদের কপালে আছে? মাস দুয়েকের জন্য বিহারে কাজে যেতে হয়েছিল আর কি...

- সেকি! বিহারে!

- হ্যাঁ, স্যার ছাপড়া জেলায়। সেখানেও যে কলকাতার এমডি ডাক্তার প্র্যাকটিস করে সেটা জানতুম না।

- তা কি রকম বুঝলেন? ব্যবসাপত্র কেমন??

- আমি স্যার মাত্র তিন বার ভিজিট করেছি। তারপর আর পারলাম না।

- পারলেন না, কেন?

- প্রথমবার গিয়ে দেখি বেশ বড় চেম্বার, ঠাসা ভিড়। বাইরেও লোক দাঁড়িয়ে আছে। কার্ড পাঠিয়ে আধঘন্টা বাইরে দাঁড়ানোর পরে একগাল দাড়িওলা চটপটে এক মাঝবয়েসি ভদ্রলোক এসে হিন্দিতে আমাকে বললেন – ‘আসুন এবারে, স্যার আপাকে ডেকেছেন।’ বুঝলাম - এ লোকটি হলো ডাক্তারবাবুর অ্যাসিট্যান্ট কাম রিসেপশনিস্ট কাম কম্পাউন্ডার। ডাক্তারবাবু সত্যি খুব অমায়িক লোক। এত ভিড়ের চাপেও মাথাটা বরফের মতো ঠান্ডা।

সাংঘাতিক প্র্যাকটিস। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। চেম্বারের কাছেই বাড়ি। বাড়িতে লাঞ্চ সেরে একটু রেস্ট নিয়েই আবার চেম্বার। গোটা ছাপড়া জেলার মানুষের কাছে ভগবান। প্রথমবার আমাদের কোম্পানির পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে ওষুধগুলো বুঝিয়ে বললাম। খোশ গল্প করার সময় ও সুযোগ কোনটই ছিল না। বাইরে রুগীর লম্বা লাইন। হপ্তা দুয়েক বাদে আরেকবার ভিজিট করলাম। সেই একই দুর্ভেদ্য ভিড়। ঘন্টাখানেক বাদে দর্শন পেলাম। ইতিমধ্যে খবরও পেয়েছি যে উনি আমাদের প্রোডাক্ট লেখা শুরু করেছেন। স্যাম্পল রেখে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। আবার দু'হপ্তা বাদে তৃতীয় ভিজিট। সেদিন বেধড়ক গরম। তাপে ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে। হাঁসফাঁস করতে করতে গিয়ে পৌঁছলুম ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। কিন্তু এতো বড় চমক আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল তা সত্যিই টের পাইনি। বাইরে রুগী নেই। ভেতরে একটি মাত্র রুগী, তাও আবার এইমাত্র ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে বেরিয়ে আসছে। এমনকি আজকে তো দেখছি ডাক্তারবাবুর কম্পাউন্ডারও নেই। তাই অনায়াসে দৈবদর্শন। ডিটেলিং নতুন করে কিছু করার নেই। বরং মিনিট পাঁচেক খোশগল্পের শেষে কথাটা না বলেই পারলাম না। সাহস করে জানতে চাইলাম - আচ্ছা ডাক্তারবাবু , আজ এত ফাঁকা কেন?

- আর কি, অনেক তো হল। এবার পাততাড়ি গোটানোর সময় এসেছে।

- সে কি স্যার, আমাদের কি হবে!! এমন কেন বলছেন স্যার, খুব গরম পড়েছে তো, তাই হয়তো রুগী কম। আবার ভরপুর হয়ে যাবে স্যার...

- নাঃ – তার আর কোন চান্স নেই। তবে আপনাদের সেলে ঘাটতি পড়বে না।

- কোন কেস ঘেঁটে গেছিল নাকি স্যার ?

- না না, ওসব কিছু নয়। ওখানে গেলেই বুঝবেন।

অগত্যা ব্যাগ নিয়ে নিয়ে নেমে পড়লাম রাস্তায়। রাস্তার উল্টোদিকে এই ঠাটাপোড়া রোদে ওটা কিসের জটলা!!

গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম। একটা নতুন চেম্বার। নতুন সাইনবোর্ড। হিন্দিতে লেখা - ডকটর লছমন যাদব। আর এম পি, সি টি এম, বি এ এম এ, আর সি পি ও। বাপরেএএএ। এসব অক্ষরগুলো মাথার মধ্যে কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

সাহসে বুক বেঁধে উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পড়লাম। একটা কমবয়েসি ছেলে। বেশ হাসিখুশি। আমার কার্ডটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরে বসার জায়গা নেই আর বাইরে সাংঘাতিক রোদ। তাই ব্যাগ হাতে ভেতরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনিট দশেক বাদে কল এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে 'আসছি স্যার' বলে সামনে তাকাতেই চমকে হাতের ব্যাগ প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। সামনে বেশ সুসজ্জিত চেম্বারে বড় টেবিলটার ওপারে যে লোকটি বসে আছে সে আর কেউ নয়, আমার পরিচিত কলকাতার ডাক্তারবাবুর স্নেহধন্য কম্পাউন্ডার। অতিরিক্ত বলতে দাড়ি সেভ করে গোঁফজোড়া সযত্নে রাখা। আর নাকের ওপর একটা চশমা। মনে মনে ভীষণভাবে আঁৎকে উঠলেও বাইরে শুধু একটু কোঁৎকালাম। লছমনবাবু আমাকে আদর করে বসালেন। তার হুকুমে জল এসে গেল। ঢকঢক করে জলটা খেয়ে ধড়ে প্রাণ এল।

লছমন ডাক্তারকে ব্যাগভর্তি করে স্যাম্পেল দিলাম। সময় বড় কম, তাই আমার অনুসন্ধিৎসু মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন – 'আপ তো ইসকা রাজ জাননা চাহতে হো - হ্যায় না ?' আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম – 'হাঁ, আমি তো বেচ্যান হুঁ।

- ইয়ে কোই জাদু নেহী। ডাগদরি সেবা জাদু সে নেহী চলতা ।

- তো ক্যায়সে!

- মরীজ আতে হ্যায় সর দরদ, ছাতি দরদ, পেট দরদ, ঘুটনেমে প্যারমে দরদ লেকে। ঔর ডাগদর সহাব সিরিফ পেট ঔর ছাতি মে টেথো বিঠাতে হ্যায়। অ্যায়সে ক্যায়সে চলেগা !! নতীজা যো হোনা হ্যায় ওহি হুয়া...

- লেকিন স্যার আপ ক্যা করতে হ্যায় ?

- ম্যায় মেহনতী হুঁ, ধোঁকেবাজী নেহী করতা হুঁ। যো সরমে দরদ লেকে আতে হ্যায় উসকা সরমে, যো ঘুটনেমে দরদ লেকে আতে হ্যায় উসকে ঘুটনেমে তুরন্ত টেথো ফিট কর দেতা হুঁ।

স্যার, তার পরদিনই কোম্পানির বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমি কলকাতায় ফিরে আসি।

রহস্য এবং লেখক

উত্তরায়ন

১.

সেই লোকটাই না! ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, বাবরি চুল, চোখে সেভেন্টিজ মার্কা একখানা ভিন্টেজ রোদচশমা। গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে রংচটা ডেনিম জ্যাকেটটাও বেশ দেখা যাচ্ছে। একটা মস্ত বড় হাই তুলতে গিয়েও হঠাৎ করে থেমে খানিকটা পেছনে হেঁটে জানালা থেকে সরে এলেন অনাদিবাবু। সকাল সন্ধ্যে একটা আনওয়ান্টেড লোক তারই কটেজের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। এটা তো ভাল কথা নয়। কলকাতা থেকে এত দূরে এসেও শহুরে লোকজনদের সংস্পর্শ এড়ানো না গেলে লাভের লাভ কি হল? তাছাড়া ওই লম্বা, দেড়ো লোকটার যদি কোন বদমতলব থাকে! সব সিনেমায়, গল্পেই তো এই গেটআপের লোকজনরাই বাজে কাজটাজ করে থাকে। শেষে হেরে গেলেও যা কিছু ঘটনা ঘটে সে তো এদের জন্যেই। একটু বেশি ভাবনা চিন্তার উদ্রেক হলে বা উত্তেজিত হলে হাতের পেনটা অটোম্যাটিক তাঁর মুখে চলে যায়। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পেন চিবোতেই এক টুকরো প্লাস্টিক মুখে চলে গেল। থু থু করে সেটা ফেলেও দিলেন। তারপর আবার জানালার বাইরে উঁকি দিতেই গাছের আড়ালে লোকটা আর নেই। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এসে বসলেন খাটে। দেওয়ালে ঝোলানো আয়নাতে নিজের মুখটা চোখে পড়তেই হঠাৎ একটু আঁতকে উঠলেন। নাঃ ভয় পাওয়া চেহারা তো মনে হচ্ছে না। হাঁক পাড়লেন - বসন্ত, অ্যাই বসন্ত।

বসন্ত এই কটেজের কেয়ারটেকার কাম রাঁধুনি। তার মুখের চেহারাও নামের সঙ্গে সমার্থক। যৌবনের জলবসন্তের ম্যাপ মধ্যবয়সেও বর্তমান। সে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই অনাদিবাবু লাফিয়ে উঠে উত্তেজিত হয়ে বললেন – “একটা দস্যুপানা লোক বাড়ির আশেপাশে ঘুরছে

দেখেছিস?” ওপর নিচে ঘাড় নাড়লেও দাগওয়ালা মুখের ভূগোলে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না।

- তা দেখেচি বাবু। তিন দিন হল দেখচি।
- দেখছিস মানে? - বসন্তর নিঃস্পৃহতায় ভারি অবাক হলেন অনাদিবাবু।
- পসসুদিন এই বাবুটি বাজারে আমারে ডেকে কত সুখ দুঃখের কথা কইলেন। বিশের দোকান থেকে এক চ্যাঙারী জিলিপি কিনে খেতি দিলেন। বড় ভালমানুষ বাবু।
- জিলিপি খাইয়ে মাথা কিনে নিল। জানিস তো লোভে পাপ, পাপে...
- না বাবু, জানি না। আপনারেও চ্যানেন কইলেন তাই...

জ্ঞান বিতরণ সঠিক ছাত্রের কাছে যাচ্ছে বলে মনে হল না অনাদিবাবুর।

- কিঃ ? আমি যে এখানে আছি সেটাও রাষ্ট্র করা হয়ে গেছে?

বসন্ত নিরীহভাবে মুখ কাঁচুমাচু করে গামছা নিয়ে দাঁতে খুঁটতে লাগল।

- এজ্ঞে আমি না বাবু। ওই ভদ্দরনোকই তো...
- যা যা। আর মাথা খাটাতে হবে না।

বসন্ত বিদায় করে ভাবতে বসলেন অনাদিবাবু। ট্রেনের কামরাতে পুরো রাস্তাটা খবরের কাগজ থেকে মুখ সরায়নি লোকটা। জানালার এক ধারে পিঠ সোজা করে বসে ছিল। তবে তাকে মনে থাকার বিশেষ কারণ হল লোকটার বাম হাতের কব্জিতে বাঁধা মস্ত বড় চৌকো ডায়ালের ঘড়িটা। যেটা থেকে জানালার বাইরের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে মাঝে মাঝেই চোখে বড্ড লাগছিল। মনে হয় ডায়ালে চকচকে কিছুর প্রলেপ রয়েছে। ট্রেন থেকে নামার পর অবশ্য আর এসব তুচ্ছ ব্যাপার আর খেয়াল ছিল না বা থাকার কথাও নয়। চারিদিকে সবুজে ঘেরা এই নিরিবিলি কটেজটায় এসে মনটা আপনা থেকেই জাগতিক চিন্তাভাবনা মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কাগজে কলম ছোঁয়াতেই টানটান

দু'পাতা লেখাও হয়ে গেল। তারপর থেকেই এই বিপত্তি। সেই ট্রেনের কামরার লোকটা অকারণ দেখা দিতে লাগল জানালার বাইরে, গাছের আড়ালে অথবা অদূরের চায়ের গুমটিটায়। অনাদিবাবুর এই এক ঝামেলা। ছোট থেকেই মনোযোগটা তার ভারি কম। একটু এদিক ওদিক হলেই কোন কাজেই মন বসে না। নিজের বাড়িতেও সম্পূর্ণ ঘর বন্ধ করে লেখালিখি করতে বসতে হয়। তাই গত তিন দিন ধরে কলম থেকে লেখাও হাওয়া। এদিকে হাতে সময় ছিল সাকুল্যে মাত্র সাত দিন। এর মধ্যে উপন্যাসটা শেষ না করলেই নয়। বসন্তকে জেরা করবার পর তো মনে হচ্ছে তাকে ঘিরে কোনও গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে। কে জানে সে ব্যাটাও এই চক্রান্তে জড়িত কিনা। চেনা তো মাত্র এই তিন দিনের। কানের কাছে একঝাঁক মশা যেন অবিরত পিনপিন করছে। বাঁ পাটাও একটু ভারি ভারি ঠেকতে লাগল তার। মৃদু শীতকালেও ঘামতে লাগলেন অনাদিবাবু।

২.

অনাদি ব্রহ্ম নামটা মোটেও বাংলা সাহিত্য জগতে অপরিচিত নয়। তিনি একজন রহস্য লেখক। তা তিনি লেখেন ভালই। শব্দের ছদ্মবেশে একগুচ্ছ কৌতূহল যেন পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে। এপার বাংলা, ওপার বাংলা মিলিয়ে বইয়ের কাটতিও বেশ। সবচেয়ে বড় কথা হল যে তার গল্পগুলো বিশেষত ছোটদের জন্য। বাংলা সাহিত্যে এই মুহূর্তে ঠিকঠাক রহস্য উপন্যাস লেখার মুন্সিয়ানা যে গুটিকয় কয়জনের মধ্যে রয়েছে সেই বিরলতমদের একজন হলেন অনাদি ব্রহ্ম। এহেন অনাদিবাবুর মাথার সবসময় বিপজ্জনক সব রহস্যের প্লট কিলবিল করে ঠিকই, কিন্তু চেহারাটা নিছক ভেতো বাঙালির। গোলগাল মাথায় চাঁদিয়াল ঘুড়ির মাঝখানের বৃত্তটার মতই খানিকটা চুল যেন খাবলে তুলে নেওয়া হয়েছে। চোখে মোটা ধূসর ফ্রেমের চশমা। পরনে সবসময়ের সাদা পায়জামা। শুধু খদ্দরের ফতুয়াগুলো রং বদলায়। পায়ে বাটা থেকে কেনা সাত নম্বরের পাম্পশু। তার গোয়েন্দারা যখন মলাটের ভেতরে দুর্ধর্ষ সব কাণ্ডকারখানা করেন তখন হয়ত তিনি চিনি ছাড়া চায়ের কাপে আয়েশ করে চুমুক দিতে দিতে কাগজ ওলটাচ্ছেন অথবা

বালতি হাতে করে ছাদে টবের গাছে জল দিচ্ছেন। মোদ্দা কথাটা হল কেউ বিশ্বাস করবে না যে এই বেঁটেখাটো নিরীহ লোকটাই এখনকার বাংলায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্য লেখক। চেহারাটা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে বলেই তিনি পারতপক্ষে জনসমক্ষে আসেন টাসেন না। তার নিজের মতে রহস্য লেখক যতক্ষণ আড়ালে থাকবেন রহস্য ততক্ষণই বেঁচে থাকে।

ছোটদের জন্য বেরনো পত্রিকাগুলির মধ্যে সেরা হওয়ার লড়াইতে মূল প্রতিযোগিতা 'মণ্ডা মিঠাই' আর 'জিবেগজা' এই দুটি পত্রিকার মধ্যে। অনাদিবাবু লেখেন মণ্ডা মিঠাইয়ের জন্য। তাছাড়া সম্পাদক হরিসাধনবাবু অতীব সজ্জন মানুষ। টাকা পয়সাও বাকি রাখেন না। এমন সম্পাদকের জন্য লিখেও আরাম। জিবেগজার সম্পাদক আবার তারই ছোটবেলার বন্ধু অঞ্জন শিকদার। একসময় স্কুলে থাকতে দুজনেই নাটক করতেন, একসাথে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। যুগ্মভাবে কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদকও ছিলেন কিছুদিন। অঞ্জনের আর লেখক হওয়া হয়নি। তবে তার সাহিত্যপ্রীতি এবং লেখালেখির সঙ্গে জড়িত হওয়ার সুবাদে এখন জিবেগজা পত্রিকার সম্পাদক। এই মুহূর্তে অবশ্য জিবেগজার আর্থিক অবস্থা ঠিক পাতে দেওয়ার মত নয়। অঞ্জন শিকদার মাস খানেক আগে তাদের পুজো সংখ্যার জন্য অনাদিবাবুর কাছে একটা বড় গল্প চাইতে এসেছিল। ছেলেবেলার বন্ধুত্বের দোহাই পেড়ে প্রায় নামমাত্র সাম্মানিকে লেখার কথা বলতেই অনাদিবাবু নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ করছিলেন। তখন তিনি মণ্ডা মিঠাইয়ের জন্য একটা ছোটগল্প লিখতে বিষম ব্যস্ত। পেশাদার লেখক হিসেবে টাকা পয়সা ছাড়া লেখার কথা এখন আর ভাবতেই পারেন না। তাই ছোটবেলার বন্ধুকেও বলতে গেলে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে অঞ্জনের সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

কটেজের মসৃণ বিছানাতেও সেদিন সারারাত ভেবে ভেবেই ঘুম এল না তার। ভোরের দিকে একটু চোখ লেগে এলেও অভ্যাস মত অ্যালার্ম বাজতেই ঘুম ভেঙে গেল। কম ঘুমোনোর জন্যই হোক বা অহেতুক চিন্তার জন্যেই হোক, মাথার বাঁ পাশটা দপদপ করতে লাগলো অনাদিবাবুর। ডাক্তার

বদ্যির কাজ নয়। এর একমাত্র ওষুধ হল বড় এক কাপ ধোঁয়া ওঠা কড়া লাল চা। তবে এত সকালে বসন্তকে বিরক্ত করতে চাইলেন না। তার চেয়ে খানিক দূরের গুমটিটায় গিয়ে খেয়ে এলেই হয়। সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এরকম চায়ের দোকানে কত সন্ধ্যে কেটেছে। তার ওপর দিন দিন মুটিয়েও যাচ্ছেন। প্রাতঃভ্রমণটাও সেরে ফেলা যাবে। পায়ে পাম্পশু গলিয়ে হাঁটা দিলেন তিনি।

এত সকালেও দিব্যি দোকান খোলা। গোটা পাঁচেক গ্রামের লোক বড় বড় কাঁচের গ্লাসে চা বিস্কুট খাচ্ছে। কয়েকটা বড় বড় নিশ্বাস নিতে নিতে অনাদিবাবু ভাবছিলেন উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি কচুবাগান লেনের দম আটকানো সকালগুলোর কথা। ছ্যাঃ ওটা কি একটা বেঁচে থাকা নাকি! শীতকালে ধুলো, বর্ষায় জমা জল, গ্রীষ্মে প্যাচপ্যাচে গরম। লাখ লাখ মুখ গুচ্ছের রোগজীবাণু বুকে নিয়ে ঘুরছে। গুছিয়ে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলার পর চোখ ঘুরিয়ে আশপাশটা দেখতে দেখতেই অনাদিবাবুর চোখ আটকে গেল একজনের দিকে। আবার সেই লোকটা না! বাবরি চুল, ডেনিম জ্যাকেট, দুই আঙুলে একগ্লাস চা নিয়ে দূরে গাছের সারির দিকে তাকিয়ে আছে। দেখেই মনে হচ্ছে যে কোন তাড়াহুড়ো নেই। যেন পুরো সকালটা সে কাপের পর কাপ চা নিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। অনাদিবাবু এগিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে একটু ভাবলেন। আদপে তাকে খুব একটা সাহসী বলা যায় না। বেশ কিছু তুচ্ছ জিনিসে তিনি ভয়-টয় পান। তবে সেসব খুব কম মানুষই জানে। বাস্তব জীবনে ভীতু খুব একটা নন। 'অফেন্স ইজ দা বেস্ট ডিফেন্স' বিড়বিড় করতে করতেই লোকটার মুখোমুখি কাঠের বেঞ্চটায় গিয়ে ধপ করে বসে পড়লেন। এত সকালেও লোকটার চোখে থ্যাবড়া মত সানগ্লাসটা। লম্বা নাকটা মাঝখান থেকে উঁচিয়ে রয়েছে অদ্ভুতভাবে। এবার হিসেবমত লোকটার অবাক হওয়ার পালা। তবে চশমাটা মুখের অর্ধেকটা ঢেকে রাখায় এবং জবরজং দাড়ির আবরণে বাকিটা আত্মগোপন করে থাকায় সেটা বোঝা গেল না অথবা লোকটা নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিল। মাথার চুল অস্বাভাবিক রকম ঘন। গলায় একটা

দূরবীন পেন্ডুলামের মত দুলছে। অনাদিবাবু দেখেই বুঝলেন যে তিনি বেশ শক্ত ভিলেনের পাল্লায় পড়েছেন। কিন্তু লোকটা হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। বুক পকেট থেকে হাতড়ে সবজে রঙের একখানা পুঁচকে খাতা বের করে অনাদিবাবুর সামনে মেলে ধরল। বলে উঠল - অটোগ্রাফ। লেখকপ্রবর এবার সত্যিই চমকে গেলেন। এবার লোকটা পুরোপুরি মুখ খুলতেই বোঝা গেল সে অনাদিবাবুকে দেখে বেশ আপ্লুত। গলার আওয়াজ একটু নরম গোছের কিন্তু ফ্যাসফ্যাসে। গলাটা একটু চেনা চেনা লাগলেও সঠিক আন্দাজ করতে পারলেন না অনাদিবাবু। সে তো এমন অনেক মানুষকেই হঠাৎ করে চেনা মনে হয়। এই তো সপ্তাহ দুই আগে বাজারে সব্বাই হাঁ করে একটা লোকের দিকে চেয়েছিল। লোকটা পাক্কা ছবি বিশ্বাসের মত দেখতে।

- আপনাকে লাইফে চোখের সামনে দেখতে পাবো সপ্নেও ভাবি নি স্যার। উঃ! গোয়েন্দা ছিদ্রান্বেষী সরখেলের স্রষ্টা আমার সামনেই দাঁড়িয়ে। ভাবা যায়!

অনাদিবাবু যতটা ফায়ার হবেন বলেন মনে মনে ঠিক করেছিলেন, সেই আগুনটা অকালেই ফুস করে নিভে গেল।

- মানে আপনি আমাকে চিনলেন কি করে? আমি তো...

অনাদিবাবুর কথাটা এক লহমায় ধরে নিল লোকটা।

- সত্যিকারের ফ্যানদের থেকে লুকিয়ে থাকা যায় না মশাই। কলকাতায় আপনার কচুবাগান লেনের পরে দুটো পাড়া ছাড়িয়ে হরিদাস লাহা স্ট্রীটে এই অধমের বাড়ি। নাম সত্যেন সেনশর্মা। পেশায় অর্নিথলজিস্ট। সোজা বাংলায় আপনি যাকে বলেন পাখি খোঁজারু। শুধু দেখি আর ডেটাবেসে সাজাই। ভারি ইন্টারেস্টিং কাজ। একটা বিলিতি রিসার্চ কোম্পানিতে রয়েছি।

অনাদিবাবুও এবার খানিকটা উৎসাহ পেলেন। একজন রীতিমতো লিখিয়ে পড়িয়ে লোক তার লেখার ভক্ত জেনে খুশিই হলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু হেঁ হেঁ করে ফেললেন।

- তবে আমার ঘরের আশেপাশে আপনাকে দেখে...
- চোর ডাকাত বা ওই আপনার নভেলের জব্বর সুপারভিলেন জাদুকর ঘণ্টেশ্বরের মত কেউ ভেবেছিলেন। তা পারেন ভাবতে। আসলে আপনার কটেজের পেছন দিকে প্রচুর পাখি। একখানা স্ট্রিক থ্রোটেড উডপিকার মানে একটা বিশেষ ধরনের কাঠঠোকরা দেখছিলাম। দুয়েকবার আপনার সঙ্গে চোখাচুখিও হয়ে গিয়েছিল। আর আপনি তো স্যার আমাকে স্রেফ চোর ভেবেছেন হয়ত। এর আগে পাখির নেশায় কত আড়ং ধোলাই... এহ্‌ স্যরি স্লিপ অফ টাং, মানে মার টার খেতে হয়েছে।

এমন সরল স্বীকারোক্তি দেখে অনাদিবাবুর মন ইতিমধ্যে গলে গিয়েছে। অকারণ একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভেবে নিজের মূল্যবান তিনটে দিন রাত নষ্ট করেছেন তিনি। বাকি চার দিনে নিশ্চিন্তে নামিয়ে ফেলবেন গপ্পোটা। প্লটটা মনে মনে আর একবার ঝালিয়েও নিলেন। গোয়েন্দার মুখে বসানোর মত কয়েকটা জুতসই লাইনও মনে এসে গেল। ভদ্রলোককে কয়েকটা মামুলি উত্তর দিয়ে উঠেই পড়তে যাচ্ছিলেন। সত্যেনবাবু ঠিক তখুনি তাকে ধরে বসিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন। কপালের ভাঁজে গোপনীয়তার ছায়া। এদিক ওদিক তাকিয়ে ততোধিক আস্তে আস্তে বললেন

- একটা কথা বলার ছিল আপনাকে।

অনাদিবাবু টাকার ব্যাগ আনতে ভুলে গেছেন দেখে পকেট হাতড়ে খুচরো খুঁজছিলেন। মাথা নাড়লেন শুধু।

- ওই বাড়িতে তেনারা আছেন সেটা জানেন তো ! মানে শোনা যায় আর কি।

অনাদিবাবু থমকে গেলেন। লোকটা বলে কি। পাগল নাকি অন্য কিছু।

- কোন বাড়িতে আবার ?
- মানে আপনি যেই কটেজে আছেন এখন। অবিশ্যি আমি নিজে ওসব স্পিরিট, ভূত এইসব মানিটানি না তবে ওই লোকাল লোকে বলে।

বলে লোকটা দু'আঙুলে একটা টুস্কি মেরে যেন উড়িয়েই দিল কথাটা। কিন্তু অনাদিবাবুর মুখে এখন আর কোনও কথা নেই। খালি গ্লাসেই ভুল করে একবার চুমুক দিয়ে ফেললেন। লোকটা সেটা দেখে ফিক করে হেসে নিয়ে ভীষণ গম্ভীর রকম মুখ করে বলল

- আসলে বছর পাঁচেক আগে এক দম্পতি এই বাড়িতেই থাকতে এসে সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়েছিল। পুলিশ ফুলিস হয় নি। একে গ্রাম। তার ওপর ব্যবসায় বদনামের ভয়। চেপে দিয়েছিল মশাই। স্রেফ চেপে দিয়েছিল।
- কিন্তু হরিসাধনবাবু তো আমাকে কিছু... মানে এটার মালিকের বন্ধু। আমার খুব ঘনিষ্ঠ।
- বন্ধুর বন্ধু তো বন্ধুই হল মশাই। তবে মানুষ চেনা অত্যন্ত দুরূহ কম্ম। বাল্যবন্ধুকেই অনেক সময় লোকে চিনতে পারে না। আপনাকে এসব বললে হয়ত আপনি হেসেই উড়িয়ে দিতেন। তাই উনি বলেন নি।

অনাদিবাবুর ভীষণ রাগ হতে লাগলো হরিসাধন বাবুর ওপর। এমন জায়গায় এসেছেন তিনি এখানে না আছে একটা টেলিফোনের ব্যবস্থা। না আছে ঠিকঠাক যানবাহন। চল্লিশ কিলোমিটার দূরের স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ে সপ্তাহে একবার। ফোন করতে গেলে ভরসা সেই দুই গ্রাম দূরের পোস্ট অফিস। হরিসাধনবাবু নিজেই গাড়ি ঠিক করে দিয়েছেন। চার দিনের দিন এসে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। কিন্তু হঠাৎ দরকার হলে? গপ্পোটা না লিখে গেলেও তো কথার দাম থাকবে না। এসব ভেবে তিনি খানিকক্ষণ গুম মেরেই ছিলেন। হঠাৎ চটকা ভাঙল লোকটার কথায়।

- তাই বলি কি স্যার একটু সাবধানে থাকবেন। আপনার গপ্পের গোয়েন্দাদের মত যখন তখন বেরোবেন না। শহর তো নয়। গ্রামে গঞ্জে এসব ঠিক উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অনাদিবাবু আনমনে চায়ের দাম দিতে ভুলে গেলেন। সোজা হাঁটা লাগালেন কটেজের দিকে। পেছনে তাকিয়ে দেখলেন সত্যেনবাবুকেও আর দেখা যাচ্ছে না। আবার দূরবীন বাগিয়ে কোন পাখির পেছনে ছুটেছেন হয়ত। ধীরে ধীরে কটেজের সামনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরনো বাগানটার মধ্যে এসে পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদেই তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে তাঁর পা দুটো কাঁপছে।

ঘরে ঢুকে সোজা বাথরুমে ঢুকে দুই মগ জল মাথায় ঢেলে লেখার টেবিলে বসলেন। চুলোয় যাক ভূত। এসব কিসসু হয় না। মানুষ মরে গেলে খুব বেশি হলে ধোঁয়া হতে পারে কিন্তু ভূত? নেভার। কিন্তু ওই যে এনার্জি। ভর থেকে কি এনার্জিটা আত্মায় কনভার্ট হয়ে যায়! এনার্জি আর ভূত কি একই জিনিস! দুইই তো অবিনশ্বর। একটা ফিজিক্সের বইতে আর একটা মনের মধ্যে। এসব কি ভাবছেন অনাদিবাবু। নিজের ওপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন তিনি। কিন্তু লোকটা অজান্তেই তাঁর একটা ভীষণ দুর্বল জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেলেছে। ছোটবেলা থেকেই যে তাঁর ভূতে আর অন্ধকারে ভীষণ ভয়। একলা থাকলে সারা রাত আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। ডাক্তারও দেখিয়েছিলেন। ওখানেই জানতে পেরেছেন যে অন্ধকারের ভয়কে লাইগোফোবিয়া আর ভূতের ভয়কে স্পেকট্রোফোবিয়া বলে। স্কুলে থাকতে একবার বন্ধুদের সাথে সন্ধেবেলা গ্রামের শ্মশানে গিয়ে দূর থেকে চিতা জ্বলতে দেখেই অজ্ঞান হয়ে যান। টানা দুদিন অজ্ঞান ছিলেন। তখন থেকেই ভূতের ভয় আরও আঁকড়ে ধরেছে। এই বুড়ো বয়েসেও তার অন্যথা ঘটেনি। স্কুলের বন্ধুরা জানত। কিন্তু বুড়ো বয়সের বন্ধু হরিসাধনবাবু এসব বৃত্তান্ত জানবেনই বা কি করে। ওনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। লেখার জন্য একটা নির্জন আর সবুজ জায়গা চেয়েছিলেন অনাদিবাবু, তাই বিনা শর্তে আর বিনামূল্যে তাঁকে সুন্দরবনের কাছে এই গ্রামে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হরিসাধনবাবুর এন আর আই বন্ধুর কটেজ এটা। খাওয়া দাওয়াও তোফা। গ্রামের পুকুরের মাছ,

বাগানের ফল। অজ্ঞাতবাসে ঠাণ্ডা মাথায় বসে 'মণ্ডামিঠাই' এর পুজোসংখ্যার জন্য একটা জব্বর লেখা লিখে দেওয়ার কথা। পত্রিকার পুজোসংখ্যার বিজ্ঞাপনে তাঁর নামও বেরিয়ে গেছে। লেখাটা না দিতে পারলে সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়বে। হাতের কলমটা অজান্তেই একটু জোরে আঁকড়ে ধরলেন। দু'চোখ বন্ধ করলেন।

৩.

দিন পাঁচেক পরে বেহালায় মণ্ডামিঠাইয়ের অফিসের দরজা ঠেলে বেরোতে দ্যাখা গেল অনাদিবাবুকে। টাকের চারপাসের চুল উস্কোখুস্কো । চোখের নিচে কালিমা, মুখের লালিত্য পুরো গায়েব। লালচে চোখের দৃষ্টি খানিকটা উদ্ভ্রান্ত ধরনের। দাড়ি কামাননি বেশ কিছুদিন। ভুল করে একটা পুরনো ছেঁড়া পাম্পশু পরে রয়েছেন। চায়ের দোকানে শোনা সেই ভূতের কাহিনি শোনার পর তিনটে পুরো দিন কেটেছে প্রায় না ঘুমিয়ে। বসন্তকে প্রশ্ন করে করে পাগল করেছেন কিন্তু কোন আত্মহত্যার ইতিহাস খুঁজে পান নি। আর বাড়ির মালিকের হদিশ পাওয়া তো ভীষণই শক্ত। তিনি ফ্র্যাঙ্কফুর্ট কি হাভানায় চুরুটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন। গুজব বা ঘটনাটা মিথ্যে হোক বা সত্যি হোক; লেখাটেখা তো স্রেফ ব্রহ্মতালুতে উঠে বসেছিল। চিন্তার পর্দাটায় কে যেন জব্বর এক পোঁচ কালি ঢেলে দিয়েছিল। এক পাতাও আর এগোয়নি। বস্তুত একজোড়া ভূতের গুজবের জন্য এই বছর পুজো সংখ্যায় তাঁর কোন টাটকা লেখা ছাপা হবে না। সম্পাদক হরিসাধনবাবু অভিজ্ঞ মানুষ। এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লেখা হয়নি দেখে সামলে নিয়েছেন। লজ্জায় না লেখার কারণ বলা যায়নি আর তিনিও খুঁচিয়ে জানতেও চাননি। কিন্তু মণ্ডামিঠাইকে আর একখানা ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস লিখে দেবেন বলে কথা দিতে হল অনাদিবাবুকে।

অফিস থেকে বেরিয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে ট্রামটা যাচ্ছে দেখে টুক করে উঠে পড়লেন। ইচ্ছে হল বাবুঘাটের সিঁড়িতে একটু তাজা হাওয়া সেবন করবার। মাথাটাও খুলবে আর মনটাও পরিষ্কার

হবে। লেখার চাপে কতদিন যাননি ওসব জায়গায়। ট্রামের অবিশ্রান্ত মৃদু ঝনঝন শব্দ আর শহরের জনারণ্যের কোলাহলে এসে নিজেকে এখন ভীষণ বোকা মনে হচ্ছে তাঁর। একটা তুচ্ছ কারণে এতগুলো দিন নষ্ট। জানালার ধারে বসে হু হু হাওয়ায় পুরনো দিনগুলো ভেবে একটু হাল্কা হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ফাঁকা ট্রাম। বেশির ভাগ সিটই ফাঁকা। তার পাশের সিটও এতক্ষণ ফাঁকাই ছিল। হাত পা ছড়িয়ে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে জেগে উঠতেই আবিষ্কার করলেন যে তাঁর পাশে আরও একজন বসে। অঞ্জন শিকদারকে চিনতে মোটেও অসুবিধে হল না। বাল্যবন্ধুকে ক'দিন আগেই প্রায় তাড়িয়েই দিয়েছিলেন ভেবে একটু খারাপই লাগল। কিন্তু অঞ্জনের ব্যবহারে কোন আক্ষেপ প্রকাশ পেল না। উল্টে হেসে বলল - কিরে ন্যাবা চিনতে পারছিস ?

অনাদিবাবু কষ্ট করে মুখে হাসি এনে বললেন - কি সব বলছিস অঞ্জন !

অঞ্জন শিকদার হাসি ফিরিয়ে দিলেন

- তোকে দেখে ভাল লাগল। ছোটবেলার নামটাও মনে পরে গেল। আমিই তো দিয়েছিলাম নামটা। সেই শ্মশানে চিতা দেখে উল্টে যাওয়ার পর। আর... লিখলি নতুন কিছু ?

অনাদিবাবু অবাক হলেন। এ তো তার বাল্যবন্ধু অঞ্জন। জিবেগজার সম্পাদক অঞ্জন শিকদার নয়।

- নারে। ভাল কিছু লিখতে পারিনি। বলতে গেলে ব্রেইন আর খাতা দুইই বিলকুল ফাঁকা।
- স্ট্রাইকিং কিছু দরকার। সেই থোড় বড়ি খাড়া... ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটল। ক্ষমতা আছে; ইউজ ইট।
- আসলে সেই অ্যামেচার ফানটা আর নেই রে। মজাটা কাজ হয়ে গেলে আর কতক্ষণ মজা থাকে বল ?

অঞ্জন শেষের কথাগুলো প্রায় কানেই নিল না।

- আমি একটা গ্রুপ থিয়েটারে জয়েন করেছি। হ্যাঁ আবার। তোর চেয়ে ভাল লিখতে না পারি, অভিনয়টা তো বেটার করতাম। এখানে হারিয়ে যাওয়া মজাটা খুঁজে পেলেও পেতে পারিস। তুই এলে ওয়েলকাম।

বাইরে বিকেলের সূর্য। পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার আগে খানিকটা জ্বলে উঠছে। আশপাশের ধুলো ওঠা বিরাট বাক্সগুলোর পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছেন সূর্যদেব। তবে তার মোটিভ পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না। এখুনি জ্বলবেন না নিভে যাবেন। অঞ্জন বলল - আমার স্টপ এসে গেছে। ফোন করিস।

অনাদিবাবু জবাব দেবার সময় পেলেন না। তার আগেই ছোটবেলার বন্ধু অঞ্জন শিকদার ট্রাম থেকে নেমে গেছেন। শুধু নেমে যাওয়ার সময় তার হাতের চৌকো ডায়ালের ঘড়িটা অস্তগামী সূর্যের আলোতেও ঝিকমিক করে উঠলো। দরজার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বহুদিন পর একাই হো হো করে হাসতে লাগলেন রহস্যলেখক।

সবার প্রিয় অ্যাসটেরিক্স

অনুভব বক্সী

আমাদের নায়ক

অ্যাসটেরিক্স আসলে একটি ফরাসি কমিকস (ফরাসি বানান: *Astérix*), যদিও একশটিরও বেশি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। প্রথম গল্প *অ্যাসটেরিক্স দ্য গল* (Asterix the Gaul; ফরাসি: *Astérix le Gaulois*) প্রকাশিত হয় *পাইলট* (*Pilote*) নামের একটি পত্রিকার ২৯শে অক্টোবর, ১৯৫৯ তারিখে নভেম্বর সংখ্যায়। এখনও পর্যন্ত অ্যাসটেরিক্সের মোট তেত্রিশটি কমিকস প্রকাশ পেয়েছে, যার মধ্যে পঁচিশটির মূল কাহিনি রেনে গোচিনি'র (René Goscinny) আর সবকয়টির ছবি এঁকেছেন অ্যালবার্তো ইউদেরজো (Albert Uderzo)। ১৯৭৭ সালে নভেম্বর মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গোচিনি প্রয়াত হন। এরপরে ইউদেরজো কাহিনি ও ছবি - দুটিরই ভার নেন। এককভাবে ইউদেরজো'র প্রথম কমিকস *অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য গ্রেট ডিভাইড* (১৯৮০)।

১৯৬১ সালে *গল* প্রথম বই হিসাবে বের হয়, যদিও মাত্র ৬০০০ কপি বিক্রি হয়েছিল। পরের বইটি হলো *অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য গোল্ডেন সিকল* (Asterix and the Golden Sickle; ফরাসি: *La Serpe d'Or*), এতে বিক্রির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। এবং এইভাবে, ১৯৬৬ সালে *অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য নরমানস্* প্রায় ১,০০০,০০০ কপি বিক্রি হয়। অ্যাসটেরিক্সের উপরে কিছু তথ্যভিত্তিক/ খেলা সংক্রান্ত বই (যেমন - *অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড ওবেলিক্স'স বার্থডে: দ্য গোল্ডেন বুক, অ্যাসটেরিক্স পোস্টার বুক, হাউ ওবেলিক্স ফেল ইনটু দ্য ম্যাজিক পোশন হোয়েন হি ওয়াজ এ*

লিটল বয়) প্রকাশিত হয়েছে। শেষ কমিকসটি হল *অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য ফলিং স্কাই* (Asterix and the Falling Sky), যা ২০১০ এর ২২ অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে বই প্রকাশের তারিখ বলতে ক্ষেত্রে মূল ফরাসি বইগুলির কথা ধরা হয়েছে। প্রথম অনুবাদ হয় *গল* বইটি (১৯৬৯), তারপরে *গোল্ডেন সিকল* (১৯৭৫)।

ওবেলিক্স এবং তার খাদ্য: *অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য গ্রেট ক্রসিং*

৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে: ইউদেরজো'র সঙ্গে

এই কমিকসগুলির মুখ্য চরিত্র অবশ্যই অ্যাসটেরিক্স। ছোটখাটো চেহারার এই মানুষটি গ্রামের পুরোহিত *গেটাফিক্স* (ফরাসি নাম: *Panoramix*) এর তৈরি জাদু পানীয় খেয়ে অসীম বলশালী হয়। অ্যাসটেরিক্স সঙ্গে সবসময় থাকে তার বন্ধু *ওবেলিক্স* (ফরাসি: *Obélix*), আর পঞ্চম বই *অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য ব্যাঙ্কোয়েট* (Asterix and the Banquet) থেকে ওবেলিক্সের সঙ্গে থাকে তার বৃক্ষপ্রেমিক কুকুর *ডগম্যাটিক্স* (ফরাসি: *Idéfix*), অবশ্য এই নামটি প্রথম পাওয়া যায় *অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা*-য়। এই কুকুরের নাম ঠিক করার জন্য পাইলট পত্রিকা একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। ওবেলিক্সকে সাধারণভাবে আমরা 'মোটা' বলতে পারি, কিন্তু সেটা তার অজান্তেই বলতে হবে, কারণ ওবেলিক্স নিজেকে 'মাঝারি' বলেই মনে করে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *ভাইটালস্ট্যাটিস্টিক্স* (ফরাসি: *Abraracourcix*) - গ্রামের মোড়ল, *ক্যাকোফনিক্স* (ফরাসি: *Assurancetourix*) - বিখ্যাত চারণকবি, *ফুললিয়টোম্যাটিক্স* (ফরাসি: *Céautomatix*) - কামার (*গল*-এ যে কামারকে আমরা দেখতে পাই তা পরে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে; এর এখনকার চেহারা পাওয়া যায় *নরমানস্* থেকে), *আনহাইজিনিক্স* (ফরাসি: *Ordralfabétix*) - মৎস্য ব্যবসায়ী, *জুলিয়াস সিজার, রাণী ক্লিওপেট্রা,* কিছুসংখ্যক *পাইরেট* ইত্যাদি।

বামে ইউদেরজো (এপ্রিল ২৫, ১৯২৭-) আর ডাইনে গোচিনি (এপ্রিল ১৪, ১৯২৬–নভেম্বর ৫, ১৯৭৭)

অ্যাসটেরিক্সের প্রথম দিককার স্কেচ

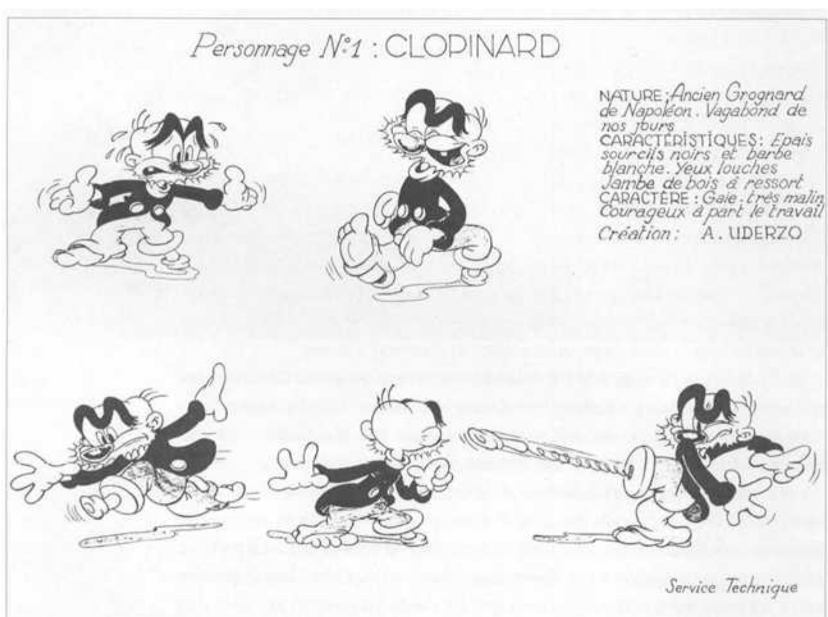

ইউদেরজো'র একটি পুরনো কমিকস: *ক্লোপিনার্ড* (*Clopinard*)- ছোটোখাটো চেহারার একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, যার একটি পা নেই

ওমপা-পা

ওয়াল্ট ডিজনি'র কাজ তাঁদের উপরে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। অ্যাসটেরিক্সের আগে তাঁরা *ওমপা-পা* (*Oumpah-pah)* নামের একটি কার্টুন চরিত্র তৈরি করেছিলেন - যাতে আছে অষ্টাদশ শতকে আমেরিকার একজন আদিবাসীর গল্প। আগস্ট ১৯৫৯-এ তাঁরা অ্যাসটেরিক্স নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং মাত্র দু'মাসের মধ্যে *গল* –এর কাজ শেষ হয়। প্রথমে ইউদেরজো'র ইচ্ছা ছিল অ্যাসটেরিক্সকে বড়সড় চেহারার সৈনিক হিসাবে তৈরি করবেন, পরে গোচিনির পরামর্শ মত পাল্টান। খানিকটা অ্যান্টিহিরো'র চেহারা নিয়ে অ্যাসটেরিক্স জন্মায়। বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী হিসাবে তাকে সৃষ্টি করা হয় - আর, এই জন্য তার সঙ্গে দেওয়া হয় অপেক্ষাকৃত বোকাসোকা এবং পেটুক ওবেলিক্সকে। কমিকসগুলির কিছু কিছু চরিত্র তাঁদের নিজেদের আদলে তৈরি, উদাহরণ হিসাবে *অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য ব্ল্যাক গোল্ড* (১৯৮১)–এর *সল বেন এফিশুল* (*Saul Ben Ephishul*)–এর কথা বলা যায়- এটিকে গোচিনি'র আদলে তৈরি করেছেন ইউদেরজো।

ছবিতে শিল্পীদ্বয়ের চেহারার ছাপ লক্ষ্য করার মতো, এছাড়া খোদিত ছবিতে তাঁদের নাম গ্রীক হরফে লেখা আছে; গোচিনি ইউদেরজো'কে বলছেন 'Despot', আর ইউদেরজো গোচিনি'কে বলছেন 'Tyrant': *অলিম্পিক গেমস*

সল বেন এফিশুল- একেবারে বাম দিকে: *ব্ল্যাক গোল্ড*

গল্প ভাবার কাজ চলছে

জুলিয়াস সিজারের দুই কর্মচারী : (চেনা চেনা লাগছে না!) *বেলজিয়াম*

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে অ্যাসটেরিক্স গল্প অনেকটাই সঠিক, পোশাক-খাদ্য-শিল্প-সংস্কৃতি-গৃহস্থালি'র প্রায় যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে ঘটনার মধ্যে কিছুটা কল্পনা তো থাকবেই। তাই, ব্রিটেনে চায়ের প্রচলন (*অ্যাসটেরিক্স ইন ব্রিটেন*), গিজা'র স্ফিংসের নাক ভাঙার কারণ (*অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা*), আমেরিকা আবিষ্কার (*অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য গ্রেট ক্রসিং*) নিয়ে আপত্তি ওঠে না। কাহিনি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রচুর মজার ঘটনা ছাড়াও এতে আছে দারুণ সব কথোপকথন। জুলিয়াস সিজার অনেক জায়গায় নিজের বিখ্যাত কোটেশন পুনরাবৃত্ত করেছেন। সব কয়টি ছবি বেশ উপভোগ্য, যার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ্য রোমান সৈন্যদের সঙ্গে মারামারি দৃশ্য। কার্টুন মানেই একধরণের ক্যারিকেচার। পাইরেট'রা (অন্য একটি কমিকসের চরিত্রগুলি'র), সিজার (কোনো একজন আগ্রাসী একনায়কের) ক্যারিকেচারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া, *ব্রিটেন*-এ আছে বিটলস (The Beatles)-এর ক্যারিকেচার, *ওবেলিক্স অ্যান্ড কোং*-এ পাওয়া যাবে লরেল-হার্ডি'র ক্যারিকেচার।

নাক ভাঙার আসল কারণ : *ক্লিওপেট্রা*

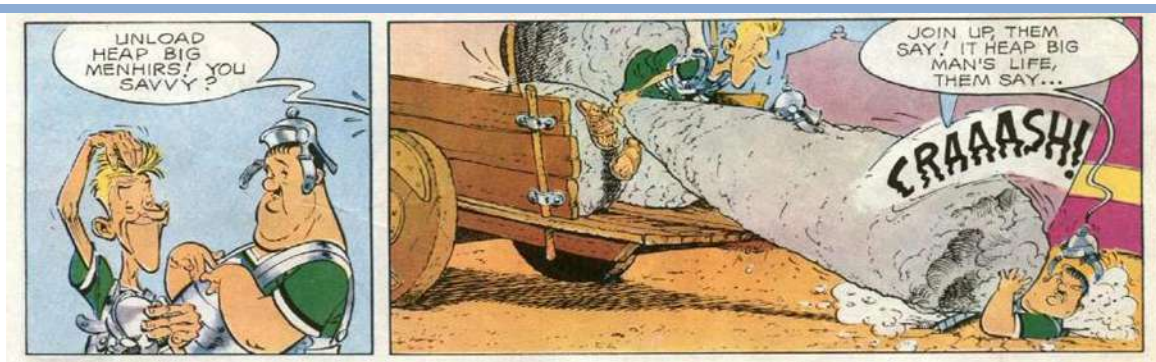

লরেল-হার্ডি (Laurel-Hardy)'দের নিয়ে মিমিক্রি: *ওবেলিক্স অ্যাণ্ড কোং*

বন্ধুকে নিয়ে আঁকা ইউদেরজো'র শেষ কার্টুন: মেয়ের জন্য একটি পুডল (Poodle) কুকুর কিনে নিয়ে যাচ্ছেন

ইউদেরজো'র আঁকা কার্টুনগুলি খুবই উঁচুদরের - একথা বলা'র অপেক্ষা রাখে না। অনেক ঐতিহাসিক ছবি-স্থাপত্য-ভাস্কর্য- সিনেমার পোস্টার- অন্যান্য কার্টুন প্রভৃতির প্যারডি দেখতে পাওয়া যায় তাঁর ছবিগুলিতে - যা আঁকা মোটেই সহজ কাজ নয়। যেমন, *রেমব্র্যান্ট*-এর আঁকা একটি

ছবির প্যারডি আছে *অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য সুথসেয়ার* (Asterix and the Soothsayer)-এ। তাঁর কার্টুনগুলির একটা বিশেষত্ব হলো বৃহৎ নাক।

জ্যেষ্ঠ পিয়েটার ব্রিউগেল (Pieter Breughel the Elder)-এর আঁকা *একটি গ্রামীণ বিবাহ* (The Peasant Wedding), ১৫৬৬

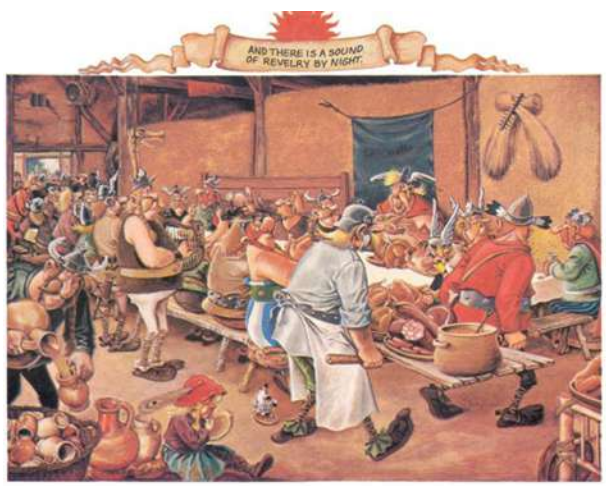

ভোজ চলছে: *বেলজিয়াম*, ১৯৭৯

রেমব্র্যান্ট (Rembrandt)-এর *ডাক্তার নিকোলাস টল্পের শারীরবিদ্যা পাঠ* (*The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp*), ১৬৩২

স্যুথসেয়ার, ১৯৭২

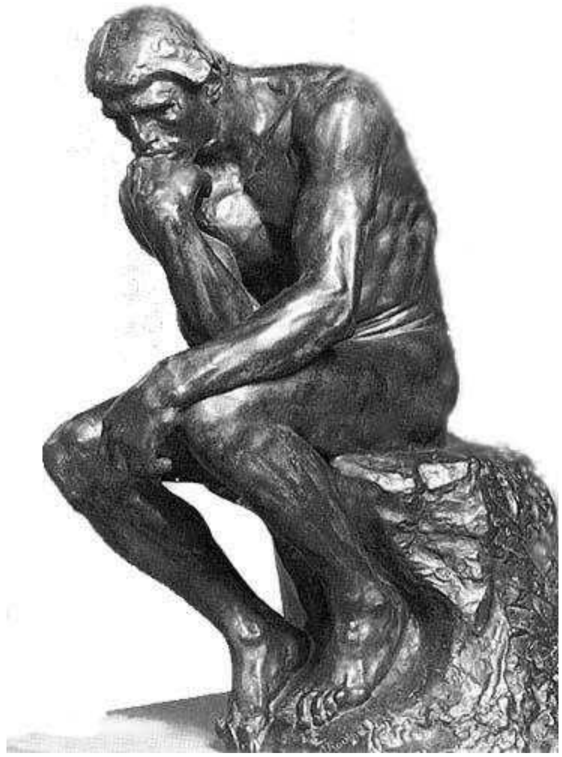

অগস্তে রুঁদ্যা (Auguste Rodin)’র *চিন্তামগ্ন মানুষ* (The Thinker), ১৮৭৯ - ৮৯

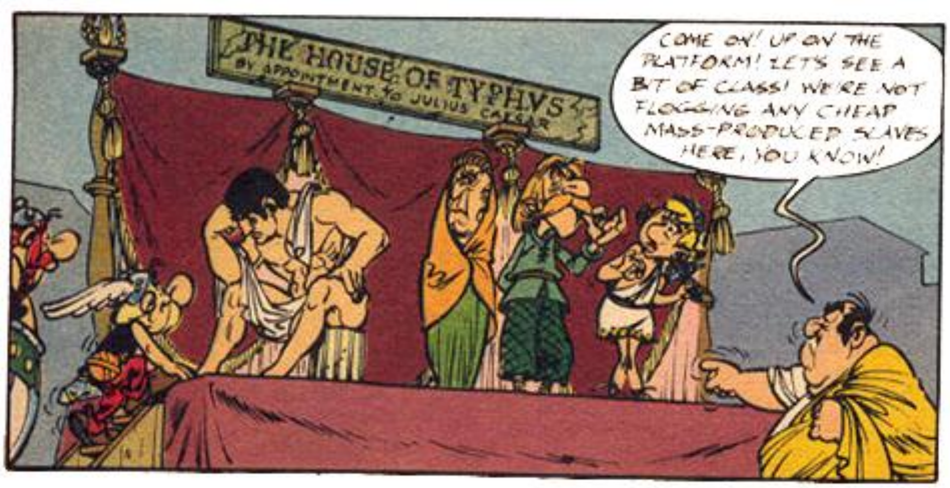

অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য লরেল রীথ (Asterix and the Laurel Wreath), ১৯৭২

ক্লিওপেট্রা কার্টুন সিনেমার একটি দৃশ্য'

বলতে গেলে, ১৯৬৬ সালের পর থেকেই অ্যাসটেরিক্স নিয়ে বিরাট উন্মাদনা তৈরি হয়, তাকে নিয়ে অনেক নতুন নতুন গবেষণা শুরু হয়। এমনকি, একটি জার্মান প্রবন্ধে লেখা হয়, গেটাফিক্সের কাপড়ের রং লাল- সাদা- এবং নীল, যা আসলে ফরাসি পতাকা'র রং সূচিত করে। শিল্পীদ্বয় প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তাঁদের কেবল একটাই উদ্দেশ্য, নিজেদের এবং অপরকে আনন্দ প্রদান। অ্যাসটেরিক্সের বাঁধভাঙা সাফল্য কমিকসকে জাতে তুলে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রম চালু হয়, সংবাদপত্রে এই নিয়ে আলাদা বিভাগ চালু হয়। প্যারিসের উপকণ্ঠে থিম পার্ক গড়ে ওঠে (১৯৮৯), যেখানে অ্যাসটেরিক্সের গ্রামের ধাঁচে গ্রাম রয়েছে। এমনকি, ফ্রান্সের একটি কৃত্রিম উপগ্রহের নাম পর্যন্ত রাখা হয়। কমিকস নিয়ে আরো নতুন নতুন কাজ হতে থাকে। অ্যাসটেরিক্স সিনেমা তৈরি হয় - মোট ১৩টি, যার মধ্যে ৮টি অ্যানিমেশন *(অ্যাসটেরিক্স দ্য গল, অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা, অ্যাসটেরিক্স ভার্সাস সিজার, অ্যাসটেরিক্স ইন ব্রিটেন, অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য বিগ ফাইট,*

অ্যাসটেরিক্স কনকার্স আমেরিকা, অ্যাসটেরিক্স অ্যাণ্ড দ্য ভাইকিংস এবং *দ্য টুয়েলভ টাস্কস্ অফ অ্যাসটেরিক্স*)। ১৯৬৭ সালের *গল* হলো প্রথম সিনেমা, যা ৬৭ মিনিট দীর্ঘ। এরপর ১৯৬৮ সালে *ক্লিওপেট্রা* নিয়ে দ্বিতীয় সিনেমাটি তৈরি হয়, এবং তা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে (৭২ মিনিট)। ভিডিও গেম, পটাটো চিপস, টম্যাটো সস, পানীয় জল, মুরগির মাংস, ডিটারজেন্ট- আরো অনেক পণ্যের নাম দেওয়া হয়েছে এই চরিত্রের নামে। ইন্স্যুরান্স এজেন্ট হিসেবেও তাকে দেখানো হয়েছে। একদিন ইউদেরজো একটি মেট্রো স্টেশনে অ্যাসটেরিক্স পাশাপাশি তিনটি পোস্টার দেখেন - তিনটি আলাদা আলাদা দ্রব্যের বিজ্ঞাপন - এরপর তাঁরা অ্যাসটেরিক্সকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। অবশ্য, ইউদেরজো নিজে খুব হালকা চালে কিছু কমিকস এঁকেছেন এদের নিয়ে - যেগুলিতে মূলত কোনো জিনিসের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক নিয়ে মস্করা করেছেন। তাছাড়া অনেক আধুনিক বিষয়কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে - প্রসঙ্গত *ব্ল্যাক গোল্ডে*র পেট্রোলিয়াম দ্বারা সামুদ্রিক দূষণের কথা বলা যায়।

বিজ্ঞাপনে অ্যাসটেরিক্স (এক)

বিজ্ঞাপনে অ্যাসটেরিক্স (দুই)

নিজেই হতভম্ব

গাড়ি তৈরির কারখানায়

রাগবি খেলা: *ব্রিটেন*

১৯৭৪ সালে এই দুই বন্ধু *স্টুডিও ইডিফিক্স* নামে একটি অ্যানিমেশন কোম্পানি খোলেন, অবশ্য তা ১৯৭৮ সালেই বন্ধ হয়ে যায়। এর লোগো *মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ার* (Metro-Goldwyn-Mayer) এর অনুকরণে তৈরি; কেবল দু'টি পার্থক্য আছে - সিংহের জায়গায় ডগম্যাটিক্সের ছবি, আর *'Ars Gratia Artis'* (*'Art for Art's Sake'*) -এর জায়গায় লেখা রয়েছে *'Delirant Isti Roman!'* (*'These Romans Are Crazy!'*)। এখান থেকেই বেশ কিছু অ্যানিমেশন সিনেমা তৈরি হয়, যেমন-*গল, ক্লিওপেট্রা, দ্য টুয়েলভ টাস্কস্ অফ অ্যাসটেরিক্স* (১৯৭৬; ফরাসি: Les Douze Travaux d'Astérix; এটিই একমাত্র সিনেমা যার কাহিনি পুরোপুরি নতুন - অন্য কোনো গল্প থেকে নেওয়া নয়, যদিও পরে একটি বই বেরিয়েছে; এই সিনেমাটির অপর নাম *অ্যাসটেরিক্স কনকার্স রোম*) ইত্যাদি। *লাকি লুক*-এর দুটি সিনেমাও বের হয় এখান থেকে - *ডেইসি টাউন* (*Lucky Luke in Daisy Town*, ১৯৭১) এবং *ব্যালাড অফ ডাল্টনস্* (*Lucky Luke in Ballad of the Daltons*, ১৯৭৮)।

স্টুডিও ইডিফিক্সের লোগো (স্কেচ)

দু'জনে তাঁদের কাজের অনেক স্বীকৃতি পেয়েছেন। এর মধ্যে আছে বহু নামকরা পুরস্কার। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, এইরকম একটি অনুষ্ঠানে বুনো শুকরের রোস্ট রান্না হয়েছিলো। এই গিমিকটা বেশ প্রচার পেল, ফলে তাঁদেরকে খুবই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল; কেননা এটা তাঁদের খুবই অপছন্দের খাবার।

এখানে আমি মূলত ইংরিজি অনুবাদ নিয়ে কথা বলেছি, তাই কয়েকজন অনুবাদককে বাদ দেওয়া যায় না। দু'জনের নাম অবশ্যই করতে হয় – অ্যানথিয়া বেল (Anthea Bell) আর ডেরেক হকরিজ (Derek Hockridge)। অনুবাদের সময় কিছু কিছু ছবি নতুন করে আঁকা হয়েছে।

নতুন করে আঁকা ছবি: *ক্লিওপেট্রা*

অবশ্য, একথাও বলা প্রয়োজন যে, অনেক অনুসন্ধান এবং সাবধানতা সত্ত্বেও কিছু ভুল থেকে গেছে, যেমন - *লুক্সর মন্দির*-এর স্তম্ভ, যা আসলে গ্রিসের ক্রীট (Crete) দ্বীপে অবস্থিত (*ক্লিওপেট্রা*); বেলজিয়ামের সমুদ্রতীরে কোনো ঘাস, গাছ-পালা কিংবা টিলা নেই, পুরোটাই বিস্তৃত বেলাভূমি (*অ্যাসটেরিক্স ইন বেলজিয়াম*)- প্রভৃতি।

লুক্সর মন্দির: ক্লিওপেট্রা

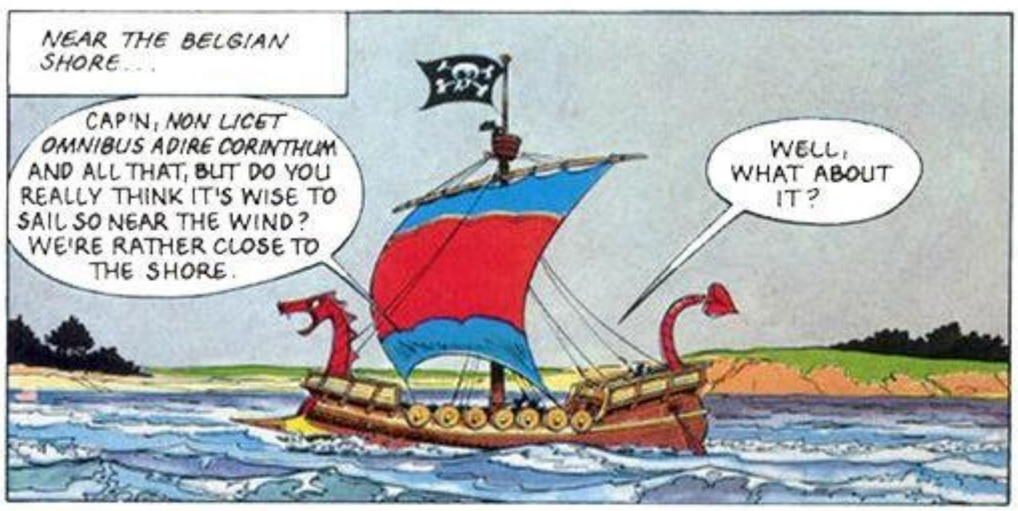

সমুদ্রতীর :*বেলজিয়াম*

বাংলায় অ্যাসটেরিক্স এর অনুবাদ প্রকাশিত হয় *আনন্দ পাবলিশার্স* থেকে, যদিও এখনও পর্যন্ত অল্প কিছু কমিকসের অনুবাদ হয়েছে। খুব সহজ এবং সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করার পাশাপাশি বাংলায় চরিত্রের নামকরণগুলি তথা হাস্যরস তৈরিতে এঁদের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে,

মূল ফরাসি ভাষায় - বা প্রায় সব ইংরিজি'তে লেখা বইগুলোতে বিভিন্ন ফন্ট যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে- তা এইগুলোতে পাওয়া যায় না। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে *ডারগাড* (Dargaud) মানে, ফরাসি ভাষার অ্যাসটেরিক্স যে প্রকাশনী থেকে বের হতো, তার সঙ্গে শিল্পীদ্বয়ের কিছু বিরোধ ঘটেছে।

শেষপর্যন্ত, আরও কয়েকটি ছবি

কলড্রন

লিজিওনারি

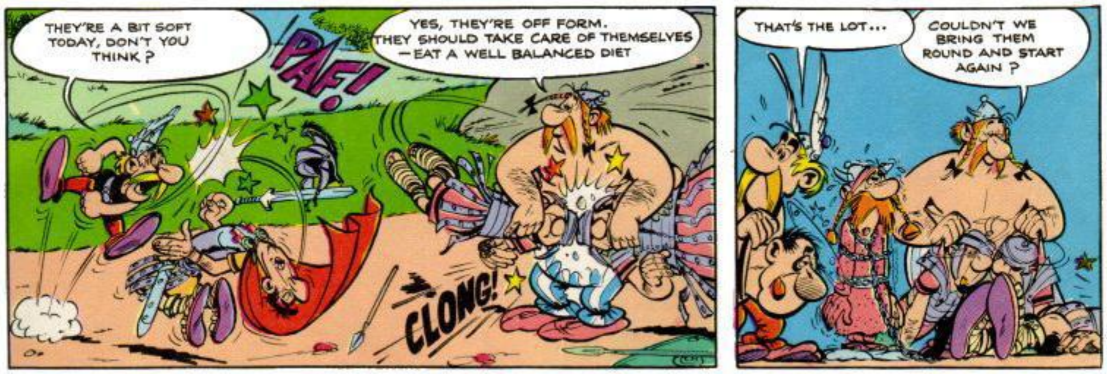

দ্য গল

ওবেলিক্স ফেল ইনটু দ্য ম্যাজিক পোশন

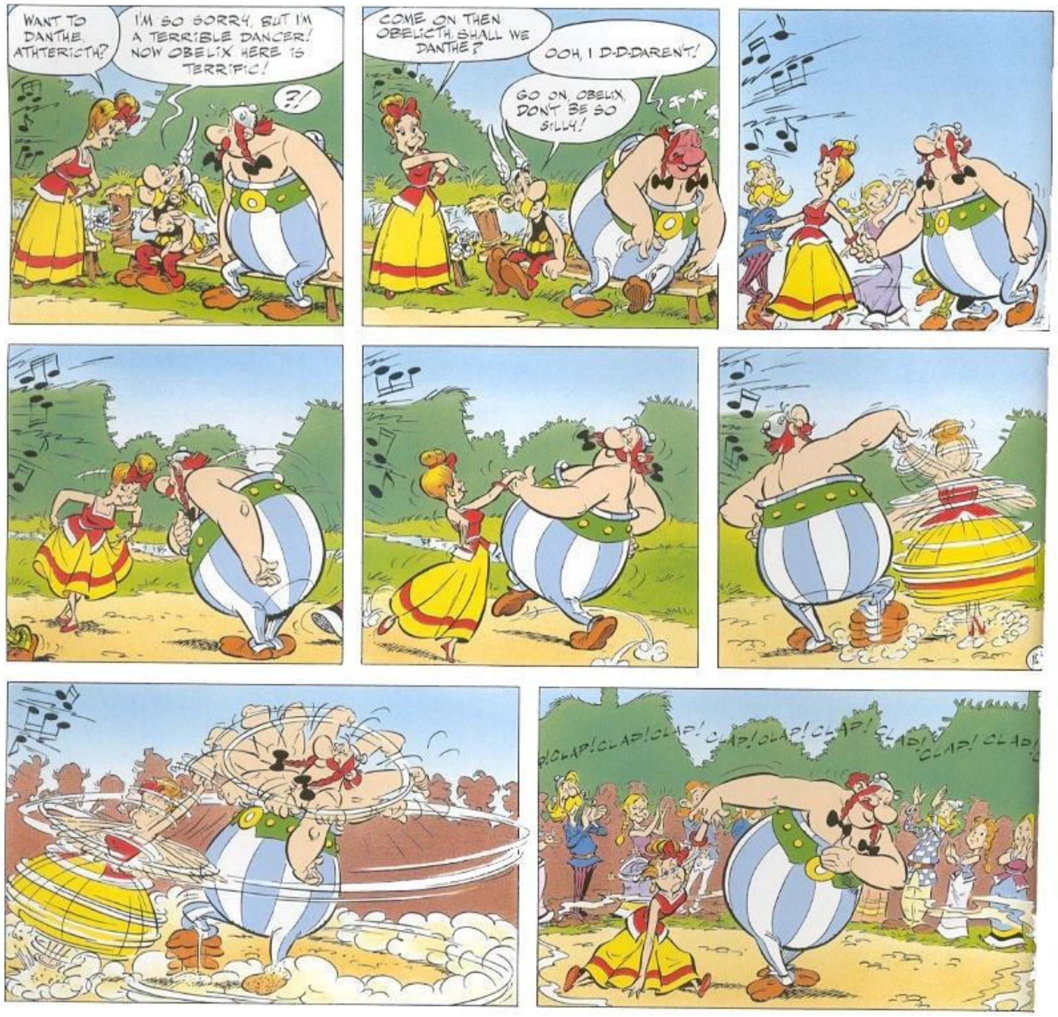

অ্যাকট্রেস

<u>কৃতজ্ঞতা:</u>

১। দ্য কমপ্লিট গাইড টু অ্যাসটেরিক্স(Peter Kessler) পিটার কেসলার -

২। ইংরাজী উইকিপিডিয়া

৩। ইংরাজীতে প্রকাশিত অ্যাসটেরিক্স কমিকস

৪। ইউটিউব

৫। আরও অনেক অনলাইন সম্পদ, যাদের নাম দেওয়া গেল না

একটি

www.Pathagar.Net
অন্তহীন প্রতীক্ষায় আশান্বিত প্রাণ....

www.pathagar.net

এবং

চর্যাপদ
এসো শব্দে বৃষ্টি নামাই

www.chorjapod.com

যৌথ প্রয়াস

বন্ধু

লেখালেখি

লেখালেখি Facebook Group

সম্পাদিকা – অদিতি কবির খেয়া

প্রচ্ছদ – শঙ্খশুভ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সাজঘর

প্রত্যয়দীপ্ত রুদ্র

অনুপম করণ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পরিচয়

জন্মদিন সংখ্যা । জুন, ২০১৪

অবকাশ